দহনে বিষ দহনে বড় জ্বালা

কল্লোল সেনগুপ্ত

।। কসমো স্ক্রিপ্ট ।। ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলকাতা-৭০০০০৯

রাত দশটা।

শীতের রাতে জ্বলছে কলকাতার পার্ক ষ্ট্রীট। জ্যোৎস্নাহীন আকাশে গা ঘেঁষে নিয়ন সাইনগুলো অন্ধকারকে যেন ঝলসে দিচ্ছে। নীচের মেটালিক পেভমেণ্টেও হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আলোর রহস্য-রঙীন বন্যা। ট্রাফিকের ভিড় নেই। ফুটপাত ও রাস্তা, দুটোই উদাস নয়নে চেয়ে রয়েছে সেই আলোর সমারোহের দিকে।

এক বিশাল মার্সিডিজ-বেঞ্জ হোটেল ক্যারোলিনের সামনে এসে দাঁড়াল। হোটেলের ঝকঝকে পোশাক-পরা দারোয়ান দরজা খুলতে ছুটে এল।

গাড়ি থেকে নামল দুজন। মাঝারি বয়েসী। দুজনেই দামী পোশাকে আচ্ছাদিত। বেঁটে লোকটির গায়ে জেট ব্লাক উলেনের স্যুট, গলায় ফ্রেঞ্চ স্টাইলের ছাইরঙা টাই। দীর্ঘকায় সঙ্গীটির পরনে অলিভ-গ্রীন রঙের টেরিউল স্যুট, সঙ্গে একই রঙের বাটিক টাই।

গাড়ি থেকে নেমে দুজনে এক পদক্ষেপে হোটেলের লবীর দিকে এগিয়ে গেল। তবে দুজনের মধ্যে বেঁটে লোকটিই বেশী রাশ-ভারী। তার প্রতিটি পদক্ষেপ একটা নির্দ্দিষ্ট মাপ রেখে চলছিল। সে খাচ্ছিল পাইপ। আর তার সংগে তাল রেখে যে চলছিল তার মুখে ছিল ফাইভ্ ফিফ্টি ফাইভ সিগারেট।

লিফটে করে ওরা ওপরে এল। তারপর সোজা "দি ওনলি কর্ণার" নাইট ক্লাব। "দি ওনলি কর্ণার" এর দরজার পাশে হেলান-দেওয়া বোর্ডটায় লেখা ছিল : "টু-নাইট এণ্ড এভরী নাইট ক্যাবারে বাই দি সেনসেসনাল সেক্স কুইন গোল্ডী।"

একটুখানি দাঁড়িয়ে লেখাটুকু পড়ে ওরা ভেতরে ঢুকল।

—ইয়েস স্যর, স্টুয়ার্ড সন্ত্রস্ত হয়ে এগিয়ে এল—হ্যাভ য়ু গট সিটস্?

বেঁটে লোকটি সম্মতি সূচক মাথা নাড়ল।

—নেম প্লিজ?

—ভারাদ্ ওয়াজ। সঙ্গীটি উত্তর দিল।

—প্লিজ কাম।

ডায়াসের পাশে ওরা নির্দ্দিষ্ট সিটে গিয়ে বসল। স্টুয়ার্ড ড্রিঙ্কসের অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

—গোল্ডী! নামটা এর আগে শুনিনি ত, লাইনে নতুন? দীর্ঘ-কায় লোকটি মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ, সেজন্যেই এসেছি। পাইপ মুখে রেখে বেঁটে লোকটি অর্ধোচ্চারিত শব্দে বলল।

—তাহলে ত ওকে ভাগ্যবতী বলতে হবে। তোমার মত লোক যখন ওর 'শো' দেখতে এসেছে।

—হতে পারে। তবে ওকে এখন পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যহীন মেয়ে করতেই এসেছি আমি।

—কি রকম?

—একটা মৃত্যুর জন্যে নির্বাচিত হতে চলেছে সে।

দীর্ঘকায় লোকটি তার সঙ্গীর ঘোলাটে চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে নতুন সিগারেট ধরাল। আর কিছু জিজ্ঞেস করল না।

এদিকে ঘরের লাইটগুলো নিভতে শুরু করেছে। মৃদু আলোয় ডায়াসে অ্যানাউন্সার এসে দাঁড়াল।

"ভদ্রমহোদয়া ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের সময় হয়ে গেছে। আপনারা এবার আপনাদের চোখ সার্থক করুন। আমরা উপস্থিত করছি আমাদের এ বছরের নতুন আবিষ্কার—মোহময়ী, লাস্যময়ী, সেই কামনার রাণী গোল্ডীকে, গোল্ডী ইন ব্লুজ—"

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সাদা নাইলনে মোড়া একটি নরম তুলতুলে দেহ মসৃণ ডায়াসে এসে গড়িয়ে পড়ল। চোখগুলো সব চকচক করে উঠল।

অস্পষ্ট অন্ধকারে দেহটি তার চোখ-ঝলসান রূপ নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসল। তারপর উঠে দাঁড়াল। একবার বাঁদিকে, আর একবার ডানদিকে ঘুরে, সবশেষে পেছন ফিরে দাঁড়াল।

হ্যাঁ, মেয়েটার যেমন রূপ, দেহের গঠনও তেমনি আকর্ষণীয়। মনে মনে

স্বীকার করল সবাই। হোটেল ক্যারোলিন কথা রেখেছে। ওদের নতুন আবিষ্কারটি সত্যি মোহময়ী ও লাস্যময়ী। তবে কামনার রাণী কি না তা বোঝা যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে।

অর্কেস্ট্রার মৃদু স্বরের সঙ্গে গোল্ডী এবার ওর চারধারের উজ্জ্বল আলোর বৃত্তটিকে নিয়ে ডায়াস থেকে নামল। লাস্যময়ী ভঙ্গীতে দর্শকদের দিকে এগিয়ে এল। কখনো হাত দুটোকে সাপের মত খেলিয়ে, কখনো নিতম্বের কম্পনে কামনার হিল্লোল এনে, কখনো বুক দুটোকে ধনুকের মত বেঁকিয়ে সে একজনের কাছ থেকে আর একজনের কাছে ছুটে চলল।

কয়েক জোড়া হাত তখন গোল্ডীর দেহের যবনিকা তোলার জন্য উসখুস করছে।

সবশেষে গোল্ডী ওর গোপনীয়তাকে সবার সামনে আস্তে আস্তে মেলে ধরল। বহু দর্শককেই ও এ বিষয়ে সাহায্য করার জন্য সুযোগ দিয়ে ধন্য করল। কারো তখন পলক ফেলার সময় নেই। তারপর সে নাভির নীচে ত্রিভুজসম ছোট্ট অন্তর্বাস আর তার সমান্তরাল বুকের সামান্যতম আচ্ছাদনটি নিয়ে আবার ডায়াসে উঠল।

ডায়াসের পাশে বসে বেঁটে লোকটির চোখ তখন সেই দেহকে জরীপ করতে ব্যস্ত। একমাত্র এই লোকটির দৃষ্টি উপস্থিত আর সকলের দৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। সেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল গোল্ডীর লোভনীয় দেহটিকে। তবে সব কিছুই সে ওজন করে নিচ্ছিল। গোল্ডীর সুডোল অর্ধনগ্ন বুক দুটোতে উত্তাপ কতটুকু আছে, ওর নাভির চারপাশে মসৃণতা কতটা পিচ্ছিল, ওর সরু কোমর থেকে দীর্ঘ পায়ের পাতা অবধি ছড়ান কামনার সামনে পুরুষ কতক্ষণ দাঁড়াতে পারে—তাই সে বসে বসে দেখছিল।

সবই দেখল সে। তবে ডায়াসে মেয়েটির আড়ষ্টতা আর মুখে মিথ্যা কামনার ভাব ফোটাবার কষ্টকর প্রয়াসও ধরা পড়ল ওর চোখে। যেটা অন্য কোন দর্শকেরই নজরে পড়েনি।

তার দেখা শেষ হল। গোল্ডীরও প্রথম আইটেম শেষ। শেষ পর্যন্ত সে দর্শকদের মধ্যে আলোড়নের একটা ঢেউ বইয়ে অন্দর মহলে পালিয়ে গেল।

ওরাও উঠে দাঁড়াল। গোল্ডীর প্রথম আঘাতের স্নায়বিক উত্তেজনাকে

প্রশমিত করে দর্শকেরা যখন ওর দ্বিতীয় আঘাতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখন দুজন "দি ওনলি কর্ণার" থেকে বেরিয়ে এল। লিফ্‌ট থেকে নেমে লবীর ওপর হাঁটতে হাঁটতে বেঁটে লোকটি বলল—কেমন দেখলে, সোহনলাল ?

—তোফা ডিকি, তোফা। এরকম জিনিস বহুদিন আমি দেখি নি।

—এ মেয়েটি আমার লিস্টে সেভেন্থ ছিল। ওকে ধন্যবাদ, এইটথ অবধি আর আমাকে এগোতে হল না।

সোহনলাল দূরে ক্যামাক স্ট্রীটের লাল ট্রাফিক-সিগন্যালের দিকে তাকাল। এইমাত্র দেখা গোল্ডীর রক্তাক্ত দেহের দৃশ্যটা ভাববার চেষ্টা করল। কারণ, ও জানে ডিকি যখন মৃত্যুর জন্য ওকে নির্বাচিত করেছে সেটা ঘটবেই। তবে কেন এই নির্বাচন, অবাক হয়ে ও সেই কথাটাই ভাবতে থাকল।

বারটা বাজতে দশ।

ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের ইনটেরিয়র বারে তখন ভাঙা হাটের মেলা। খদ্দেররা বেশির ভাগই চলে গেছে। কয়েকজন মাত্র দারোয়ানের হাতের সাহায্যের অপেক্ষায় এদিক ওদিক বসে ধুঁকছে। মেয়েগুলো যে যার নাগর ছেড়ে এক কোণে জড় হয়ে ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে ব্যস্ত। পেছন দিকে বেয়ারাদের গ্লাশ ধোয়ার শব্দ ছাড়া সারা বারটাই নিস্তব্ধ। ক্যাশ-কাউন্টারে গোয়ানীজ মালিকও তার ক্যাশ গুছিয়ে ফেলেছে। এমন সময় বাইরের দরজাটা কঁ্যাচ কঁ্যাচ করে খুলে গেল।

ঝানু দারোয়ানকে ডিঙিয়ে এই মাঝরাতে বারের ভেতর কে ঢুকল দেখতে গিয়ে মালিকের মুখ ছোট হয়ে গেল। মেয়েরা এক সঙ্গে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে একটা চাপা গুঞ্জন করে উঠল।

আগন্তুক উনত্রিশ ত্রিশ বছরের একটি যুবক। প্রায় ছ ফুট লম্বা। মোটা জিনের নীলচে প্যাণ্ট পরনে। সঙ্গে হালকা নীল রঙের দামী সুতীর শার্ট। কোমরের বেল্টটাও বেশ দামী। তবে খুব চওড়া নয়। মাথায় ব্যাক ব্রাশ করা উসকো-খুসকো চুল। আঁট-সাট পোশাকে চটপটে ভাব নিয়ে সে সোজা ক্যাশ-কাউন্টারে পিঠ ঘেঁষে দাঁড়াল।

—হ্যালো, হাউ ডু য়ু ডু, অলক ? মালিককেই বলতে হল প্রথমে।

—ফাইন, বেয়ারারা সব গেলো কোথায়! আমার এক গ্লাশ হুইস্কি চাই।

ফেলিক্স মুখে কিছু বলতে পারল না। তবে কিন্তু কিন্তু করে বড় দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাল।

—ওদিকে তাকালে হবে কি! তুমি কি জান না এক গ্লাশ হুইস্কি খেতে আমার কতক্ষণ লাগে? অলক ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল।

—না, না, তোমার জন্য বলছি না। ফেলিক্স খোসামুদির স্বরে বলে উঠল, তবে আর সব—মানে তোমার সাকরেদরা?

—ওরা আমার পেছনে নেই। যে যার আস্তানায় আছে।

—তাহলে আর কি। একটা বেয়ারাকে ফেলিক্স হুঙ্কার দিয়ে ডাকল।—কি খাবে?

—অ্যারিস্টোক্র্যাট! তবে দেখো অ্যারিস্টোক্র্যাসিটা যেন বজায় থাকে। তোমার বারে মেয়েরা আসে বলে গ্লাশের ঝাঁঝগুলো ত সব ওরাই নিয়ে নেয়।

—কি যে বলছ। তোমার জন্য ঝাঁজওয়ালা জিনিস আছে।

ফেলিক্স বেয়ারাকে ইশারা করল। অলক কোণে দেয়ালে ঝোলানো টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেল।

বারের কোণে মেয়েগুলোর মধ্যে একজন নবাগতা ছিল। সবে লাইনে নেমেছে। সে জিজ্ঞেস করল তার সঙ্গীদের,—কিরে অমন করে তাকাচ্ছিলি কেন? তোদের ওতিথি বুঝি?

—ওতিথি! একজন সুর করে বলল, যাও না, মুখ ঘষে দেবে।

—তাহলে মাস্তান?

—হুশ! একসঙ্গে কয়েকজন ওকে দাবড়ে দিল, বলিস নি, শুনতে পেলে রক্ষে নেই।

—ওর নাম অলক। আর একজন পরিচয় করিয়ে দিল। লাইনে এসেছিস, আসল লোকটাকে চিনে রাখ। অবশ্য ওর নাম ছাড়া আর কোন হুলিয়া আমরা জানিনা। তবে ও হচ্ছে আসলি পুরুষ মানুষ।

—সেদিন তুই ছিলি গীতা, যেদিন মকবুলকে ও ঝাড় দিল? আর একজন বলল।

—মকবুল! সেই দাগী গুণ্ডাটাকে? নবাগতাটি শিউরে উঠল।

—হ্যাঁ, ঐ মাস্তানের মাস্তানটাকে। জানিস, একদিন ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম। যা দাবড়ে দিল না আমাকে, ভাবলে এখনো ভয় করে।

—ছোঃ, তুই কি রে! লুসিকেই ভাগিয়ে দেয় ও, আর তুই কোন ছার।

নবাগতাটি তখন সম্মোহিত চোখে ছেলেটির দিকে তাকিয়েছিল। একটি মেয়ে তার চিবুক ধরে টান দিল।—ঝিল্লি, ওদিকে তাকাস্‌নি, আঙুরফল টক।

কিন্তু মুখটা ঘুরিয়ে আবার ও দেখল।

ছেলেটির মুখের গড়ন এবড়ো খেবড়ো, তবু দু-গালে শালীনতা আছে গালের চামড়া বেশ মোটা, ভাঙা চোয়াল, নাক চোখা। চওড়া কপাল। সারা মুখে রুক্ষ রুক্ষ ভাব। ওটাই বোধহয় ওর চেহারার বিশেষত্ব। মেয়েদের কাছে যা লোভনীয়। লম্বাটে মুখের সবটুকুই পুরুষোচিত ঢঙে তৈরী। চোখের রঙ ময়লা, মণি হালকা বাদামী। ও যখন কথা বলছিল, দূর থেকে ঐ মণি দুটো জ্বল জ্বল করছিল।

ফোনে কথা শেষ করে অলক টেলিফোন-বক্সের কাছ থেকে সরে এল। ঘুরে দেখল সামনের টেবলে ওর হুইস্কির গ্লাস সাজানো রয়েছে, আর তার পাশেই হেলান দিয়ে ফেলিক্সের মিনি স্কার্ট-পরা মেয়ে লুসি দাঁড়িয়ে।

—কোথায় ছিলে তুমি এ্যাদ্দিন সোনা? গ্লাশটা টেবিল থেকে উঠিয়ে লুসি ওর দিকে বাড়িয়ে দিল। তোমাকে যে এদিকে দেখিই না?

অলক ওর হাত থেকে গ্লাশ নিল।—ধন্যবাদ। তারপর এক চুমুকে গ্লাশের প্রায় অর্ধেকটা শেষ করে নিয়ে বলল—সোনার দাম এখন অনেক চড়া, সুন্দরী। মাঝে মাঝে বাজার থেকে তাই উধাও হয়ে যায়।

লুসি এগিয়ে এসে অলকের কোমর জড়িয়ে ধরল—সে দাম আমি দিতে পারব না তোমাকে কে বলেছে?

—হয়ত পারবে। কোমর থেকে লুসির হাত আলতো ভাবে সরিয়ে নিল অলক।—তবে আপাতত আমি বিক্রীর নই।

দীর্ঘকায়া লুসি বেশ স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। গায়ের রঙ টকটকে ফরসা। নাক ও মুখে তীক্ষ্ণতা আছে। তবে লালিত্য নেই। হাত পায়ের ঘেরগুলো বেশ চওড়া। যদিও সেগুলো শরীরের তুলনায় বেমানান নয়। বিশাল মাথায় চুলও অনেক। দেখলে মনে হয় যেন পরচুলা পরে আছে। বড় বড় টানা

দুটো চোখে কামনার আমন্ত্রণ।

—প্লিজ, অলক, ও ভাবে কথা বল না। অলকের হুইস্কি খাওয়া শেষ হলে পর ওর ডান হাতটা শক্ত মুঠোয় ধরল লুসি।—তোমার জন্য কতদিন বসে থেকেছি, জান?

—আমি বলেছি কি?

—কিন্তু একদিন তুমি যে বললে কি এক কাজে নিয়ে যাবে আমাকে?

—হ্যাঁ, বলেছিলাম, তবে শেষ পর্যন্ত ওরা আর একটা মেয়ে নিয়ে এসেছিল।

—ও, কাজটা তাহলে তোমার নয়?

—না, ওটা আমাদের।

—কিন্তু আমি শুধু তোমার কাজ করব।

—বেশ, যেদিন দরকার পড়বে বলব। বলেই অলক ওর হাত ছাড়িয়ে নিল। খালি গ্লাশে দশ টাকার একটা নোট গুঁজে বাইরের দিকে পা বাড়াল।

—গুড নাইট, হনি। আবেশের সুরে কথাটা বলতে বলতে লুসি দরজা অবধি এল। তারপর একদৃষ্টে ওর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো।

ইনটেরিয়র বার থেকে বেরিয়ে অলক একটা ট্যাক্সি করে সোজা এণ্টালীতে এসে পৌঁছল। তখন বারটা পঁচিশ।

এণ্টালীতে একটা কুখ্যাত গলির সামনে ওর ট্যাক্সি থামল। এই গলিতেই সোহনলালের ডেরা। ট্যাক্সিটা ছেড়ে ও সেদিকেই পা বাড়াল।

—পৃথ্বিরাজ আসে নি? সোহানলালের ঘরে শুধু ছোটেলাল ও গুলসনকে বসে থাকতে দেখে অলক জিজ্ঞেস করল।

—এখনো এসে পৌঁছয় নি। সোহনলাল দরজা বন্ধ করে জবাব দিল।

—আর আসবে কবে, কাল? অলক গম্ভীর হয়ে ছোটেলালের সামনের চেয়ারে বসে পড়ল।

—ছাড় ত ওর কথা। ছোটেলাল মুখ বিকৃত করে বলল।—শালা কোথায় পিপে ভরছে কে জানে। তুই বল, চাক্কার কি খবর?

—ওটা রেডি। নুরুলের গ্যারেজে আছে। রঙ করা হয়ে গেছে, তবে

ষ্টিয়ারিং একটু জাম।

—তুই চালিয়েছিস?

—হ্যাঁ, একটু ঘুরে দেখে এসেছি।

—ঠিক আছে ইয়ার, তালে আর ফিকর কি? আমি চালিয়ে ছাড়ব।

—তোরা প্লানটা তাহলে এবার ঝালিয়ে নে। সোহনলাল উঠে রামের আর একটা বোতল আনতে গিয়ে বলল।

—ও ঝালানো আছে। গুলসন অলকের দিকে তাকাল।—কিঁউ ওস্তাদ, সকালে যা বলেছিস তাই ত?

—হ্যাঁ। অলক ঝুঁকে বসল।—তবে তোরা ব্যাঙ্কটা ভাল করে দেখে এসেছিস কিনা বল?

—ও নিয়ে ভাবিস না। গুলসন মুখের ওপর তুড়ি মারল।—ট্যাক্সির চারপাশটা আমরা নেপে রেখেছি। গলতাটা জব্বর বার করেছিস মাইরী, যেখান থেকে ভাগবি তোরা।

সোহনলাল রামের বোতল আর একটা গ্লাস এনে টেবিলের ওপর রাখল।—তোদের প্ল্যানটা কি শুনি।

—পৃথ্বিরাজ আসুক। অলক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল। ও দেখছি মুশকিলে ফেলবে।

এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল।

—এয়েছে রে, খোল, ঢুকিয়ে নে শালাকে। ছোটেলাল সব কটা গ্লাসে রাম ঢালতে ঢালতে বলল। গুলসন দরজাটা খুলতে উঠল।

পৃথ্বিরাজ ধুমকি চড়িয়ে ঘরে ঢুকল। নেশায় চুর, তবে মাতাল নয়। বেশ বেঁটে বলে ওর এই অবস্থায় হাঁটা হাসির খোরাক যোগায়। তবে কেউ হাসল না। চোকো থুতনি লোকটার। ছোট নাকটা উঁচু-নীচু, দেখতে অনেকটা দু-বিচির তেঁতুলের মত। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। মাথায় পাতলা চুল। ভাঙা চোয়াল থেকে ওর এক ইঞ্চি চওড়া কপাল অব্দি চোখ বুলোলে যে কোনো লোকের বুক একটু কেঁপে উঠবেই। কারণ পৃথ্বিরাজের ঐ মুখের ভেতরে ঢোকা ওর ছোট গোল চোখ দুটো কখনই সুস্থ মনে হয় না।

ঘরে ঢুকেই ও বলল—দেরী হয়ে গেল মাইরী।

—না, দেরী তোর কেন হবে, আমরাই আগে এসে ধুর হয়ে গেছি। গুলসন দরজা বন্ধ করে খেঁকিয়ে উঠল।—শালা কোথায় ঘুমেছিলি রে? সোন্ধে থেকে সব ঠেক ছেনে ছেনে হদ হয়ে গেলাম।

—তোর বাপের ঠেকে বে। কানকিতে ছপ্পর ছিল? সব ছানলি আর তোর বাপেরটা ছানলি না। পৃথ্বিরাজ গম্ভীর ভাবে ধমকে চেয়ারে বসল।—হাঁরে, বল, টাঙ্কর খবর কি?

—সে ত তুই নিবি। অলক নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল। ঘুরে এসছিস ওদিকটা?

—সুবাতেই হয়ে গেছে।

—তাহলে বস, সময় নেই।

ওরা সব অলকের দিকে ঝুঁকে বসল। সোহনলাল শুধু চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট খেতে খেতে শুনতে লাগল।

—তোদের তো বলেছি, কাল ঠিক এগারটা বাজতে পাঁচে ছোটেলাল ছাড়া আমরা সবাই ব্যাঙ্কের চত্বরে এসে হাজির হব। আমি থাকব ঘড়িটার নীচে, গুলসন সিঁড়ির পাশে। আর তুই,—পৃথ্বিরাজের দিকে তাকাল অলক,—দরজার ধারের কাউন্টারে দাঁড়াবি। ঠিক এগারটার সময় আমি আর গুলসন ক্যাশ কাউন্টারের কাছে আসব। তোর তখন কাজ শুধু পাগড়িটাকে নজরে রাখা। আমি ওপরে গুলি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুলসন কাউন্টার টপকে ক্যাশ বাক্সটা নিয়ে আসবে।

—বাক্সটা কত বড়। সোহনলাল জিজ্ঞেস করল।

—খুব বড় নয়, তবে ভারী। দেড় বাই এক।

—বাক্সোটা টাঙ্কির? ছোটেলালের প্রশ্ন।

—না পর্টির। কর্তার এণ্ড কোম্পানীর ভারী পেমেণ্ট থাকবে ওটাতে। পেমেণ্ট নেওয়ার আগের দিন বাক্সটা ওরা ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেয়। ওরা আসে ঠিক সাড়ে এগারটায়। তার আগেই টানতে হবে আমাদের।

—গুলসন টানতে পারবে ত? পৃথ্বিরাজের প্রশ্ন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, পারব। ও খালাস করা কিছু নয়। তুই কিচাইনটা সামলে রাখিস তাহলেই হবে।

—না, কিচাইন কিছু হবে না। অলক গম্ভীর গলায় বলল। মোহল্লাটা দোকানদারদের জানিস ত। ভিড় ওখানে বারটার পর হয়। কিচাইনটা বরং আমরাই করব না, বুঝলি পৃথ্বিরাজ, শুধু শুধু আবার তোর কলকে নাড়তে যাস না। তবে পাগড়ির জন্য তোকে একটা ছররা খরচ করতে হবে সেটা ঠিক।

পৃথ্বিরাজ কিছু বলল না।

সোহনলাল অলকের দিকে তাকাল।—তারপর ?

—বাক্সটা নিয়ে আমি আর গুলসন পাশের গলিতে ঢুকব। পৃথ্বিরাজ সামনের বাজারে। ঐ গলির মুখে অনেক গাড়ি-পার্ক করা থাকে, তার মধ্যে ছোটেলালেরটাও থাকবে। রহিস শেঠের পোশাক পরে ছোটেলাল তখন বাজারে কতকগুলো মাল গাড়ির ট্রাঙ্কে ঢোকাতে ব্যস্ত থাকবে। আমরা গলি থেকে বেরিয়েই বাক্সটা ঐ মালের মধ্যে ফেলে ওপাশের গলিতে ঢুকে যাব।

—কিন্তু উস্তাদ, গুলসন রামের বোতলটা হাতে উঠিয়ে বলল—ডিকির মোহর লেগেছে এ কারবারে ?

—হ্যাঁ, ডিকি সব শুনেছে। অলক অন্যদিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। যাই হোক তারপর আমরা সব এখানে এসে মিলছি। বল সোহনলাল, সব ঠিক ?

—হুঁ, সোহনলাল উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ক'টার মধ্যে সব আসছ এখানে ?

—ছোটেলালকে সোজা এখানেই আসতে হবে, ওর আসতে আর কতক্ষণ। আমরা একটার মধ্যেই এসে পৌঁছব।

সবাই উঠে দাঁড়াল।

—ছোটেলাল, তুই সকালে গাড়িটা নিয়ে নিবি। দশটার সময় যাস, নুরুলকে আমি বলে এসেছি। অলক ঘড়ির দিকে তাকাল। যেতে হবে, একটা বাজে।

—হুঁ, যাবি, তবে একটা কথা শুনে যা। সোহনলাল বাধা দিল। ব্যাঙ্কের কাজটা সেরে তোকে এখানে আসতে হবে না।

—কোথায় যাব ? অলক অবাক হয়ে তাকাল।

—ব্লু-ক্যাসল। দুপুরের মধ্যে তোকে যেতে বলেছে ডিকি।

অলক দাঁড়িয়ে একটু ভাবল।—যাব। তারপর ওরা সব বেরিয়ে গেল।

ওয়েলিংটন স্ট্রীটের ওপর ব্লু ক্যাসল বার-এর সাইন বোর্ডটা সহজে কারুর চোখে পড়ে না। অক্ষরগুলো কোন এক কালে জ্বলজ্বলে রঙে লেখা ছিল। কিন্তু সেগুলো এখন রূপ পালটে কাঠের রঙে পরিণত হয়েছে। এতেই বোঝা যায় বারটা কত পুরনো। ভেতরে ঢুকলে পর ওর ঐতিহ্য দেখে রীতিমত সমীহ করতে হয়। সেখানে পরিবেশ অনেকটা রাজা মহারাজাদের নাচঘরের মত।

সারা ফ্লোর ঘিরে রক্তলাল কার্পেটের ছড়াছড়ি। দেয়ালের আনাচ-কানাচে প্যালেসিয়াল স্টাইলে কারুকার্য করা। মাথায় ভিক্টোরিয়ান যুগের ফুল-কাটা ফ্যানের সারি আর বিজলী বাতির ঝাড় লণ্ঠন। বাইরে থেকে ঢুকে কালচে মেহগনির চেয়ার টেবিলগুলো পেরিয়ে বার-কাউন্টারটা চোখে পড়ে। সেই কাউন্টারের বাঁদিকে বারের কিছু অংশ ভেতরে ঢুকে গেছে। ডানদিকে অনুরূপ একটা ফাঁকা জায়গা। আর তার পরেই বার-এর মালিক মিঃ ডি. এম. ভরদ্বাজের অফিস ঘর। অফিস ঘরের দরজাটাও মেহগনি কাঠের তৈরী। ওপরে ছোট্ট একটা নেমপ্লেট। লেখা 'ম্যানেজার'। তার নীচে লম্বা এক ফালি কাঁচ, বাইরে থেকে যেটাকে ধোঁয়াটে মনে হয়, কিন্তু ভেতরে বসে ওটা দিয়ে বাইরের সবকিছুই দেখা যায়।

ছোট্ট অফিস ঘরটা ব্লু-ক্যাসল-এর একটা ব্যতিক্রম। এখানে ঐতিহ্য নেই, সব আধুনিক। সানমাইকার টেবিল, ফোম-লেদারের চেয়ার, ফ্যান্সি টেলিফোন, ভেনেসিয়ান কাঁচের অ্যাশট্রে। তাছাড়া চারদিকের দেয়ালে সুদৃশ্য কতকগুলো র‍্যাকে নানারকম দেশী-বিদেশী মদের ডিসপ্লে।

মিঃ ভরদ্বাজ এখন অফিসে বসে কিছু হিসেবপত্র করছিলেন।

বার-এর একাধারে মালিক ও ম্যানেজার তিনি। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। চেহারায় বেঁটে খাটো, মাথায় বিশাল টাক, স্বাস্থ্য অটুট। তিনি সব সময় চেয়ারে হেলান না দিয়ে বসেন। তার দাঁড়ান ও চলাফেরার ভঙ্গীতে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা আছে। মিঃ ভরদ্বাজের মুখ গোলাকার, নাক সে অনুযায়ী বেশ লম্বা ও তীক্ষ্ণ। তার গৌরবর্ণ শরীর মেদ বর্জিত, কিন্তু গাল

'দুটো অহেতুক ফোলা। তিনি কথা বলেন খুব কম। যখন বলেন তখন তার আয়ত চোখের নির্লিপ্ত দৃষ্টি অন্যদিকে থাকে।

এই মিঃ ভরদ্বাজকে নিয়ে বেয়ারা ও বারের রোজকার অতিথিদের মধ্যে বহুরকমের কানাঘুষা হয়। কেউ বলে মিঃ ভরদ্বাজ মিলিটারির একজন রিটায়ার্ড জাঁদরেল অফিসার। আবার কেউ বলে তার পূর্ব পুরুষেরা সত্যি সত্যি কোথাকার মহারাজা ছিলেন। তবে যারা মিঃ ভরদ্বাজের কাছে বহু ধনী ও মহাজন ব্যক্তিদের আনাগোনা লক্ষ্য করেছেন তাঁদের মত অন্য রকম। তাঁরা বলেন মিঃ ভরদ্বাজের সরকারী মহলে কোন না কোন কারণে বিরাট একটা প্রভাব আছে, সেজন্যই এইসব ব্যক্তিরা তার কাছে আসা যাওয়া করে।

তবে মিঃ ভরদ্বাজ যে আসলে কি সেটা শুধু তিনি আর তার খুব কাছা-কাছির কয়েকজন ছাড়া আর কেউ জানে না। অবশ্য তাদের কাছে তিনি মিঃ ভরদ্বাজ বলে পরিচিত নন, সেখানে তিনি ডিকি। আর একমাত্র তারাই জানে ব্লু-ক্যাসল বার ও তার ছোট্ট অফিস ঘরের ছদ্মবেশে আসলে এখানে কি হয়।

সেগুলো হচ্ছে সমাজের নানা ধরনের নিষিদ্ধ কাজ। তার মধ্যে ব্যাঙ্ক রবারী থেকে গুপ্ত খুন পর্যন্ত সব আছে। ডিকির নিপুণ পরিচালন ক্ষমতার দরুণ সেগুলো এতই গোপীনয়তা ও কৌশলের সঙ্গে সমাধা হয় যে পুলিশ ও ছার, বার-এর বেয়ারারা পর্যন্ত তার কিছুই টের পায় না। আর সেজন্য বিখ্যাত ব্যবসায়ী থেকে ঝানু রাজনীতিজ্ঞ অবধি তার কাছে তাদের নানা ধরনের সমস্যা নিয়ে আসে, যেগুলোর সমাধান সোজা সরল পথে হয় না।

সেই ব্লু-ক্যাসলে অলক যখন এসে পৌঁছল তখন দুটো প্রায় বাজে। নির্জন বারটা আগলে দারোয়ান বসেছিল। তার অভিবাদনের উত্তর দিয়ে অলক নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকল। বার-কাউন্টারের কাছে আসতেই অফিস নীল আলোটা জ্বলে উঠল।

—কাম ইন। অলক ভেতরে ঢুকতেই ডিকি মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে কাগজপত্রগুলা সরিয়ে রাখল—তোমাকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে, অলক। আই থিঙ্ক য়ু ব্যাডলি নিড্ সাম ড্রিঙ্কস্।

—এখন না, পরে। অলক সামনের একটা কোচে বসল।

—ব্যাঙ্ক থেকে কোথায় গিয়েছিলে ?

—ফ্ল্যাটে। ড্রেস পালটে এলাম।

—কোন ঝামেলা হয় নি ত ?

—না। শুধু দারোয়ানের পায়ে দুটো গুলি ছুঁড়েছে পৃথ্বিরাজ।

—আর ছোটেলাল ?

—ছোটেলাল—। এতক্ষণে ও সোহনলালের ডেরায় পৌঁছে গেছে নিশ্চয়।

ডিকি মুখ থেকে পাইপটা আবার নামাল। হাতদুটো টেবিলের কানায় রেখে বলল।—আচ্ছা অলক, ছোটেলাল সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয় ?

—ছোটেলাল। অলক একটু অবাক হয়ে তাকাল। কেন বল ত ?

—ওর সম্বন্ধে তোমার স্টাডিটা জানতে চাই। এতদিন ত ওকে নিয়ে কাজ করলে।

অলক একটু ভাবল।—ছেলেটা কাজে খুব উৎসাহী ভাব দেখায়। তবে যতটা দেখায় ততটা কাজের যোগ্য কিনা ভেবে দেখতে হবে।

—গুড। ডিকি পাইপটা মুখে নিল, এটাই আমি তোমার কাছ থেকে আশা করছিলাম। ফর ইওর ইনফেরমেশন, ছোটেলাল কিন্তু সোহনলালের ডেরায় পৌঁছয়নি।

—পৌঁছয় নি ! অলক সন্ত্রস্ত হয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল। সোহনলাল ফোন করেছিল ?

—না, ও করেনি। তবে ফোনটা আমাদেরই করতে হবে ওকে। ওকে জানান দরকার ওরা যেন ছোটেলালের জন্য আর অপেক্ষা না করে।

—ছোটেলাল কোথায় ?

—আমার এখানে। সোহনলালের ডেরায় যেতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত রাস্তা ভুল করেছে ও। বলে ডিকি পাশের ফোনে সোহনলালের নাম্বারটা ডায়াল করবার জন্যে হাত বাড়াল।

অলক হেঁয়ালীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে।

ফোনে কথা শেষ করে বলল ডিকি—চল, ছোটেলালের সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে যাক।

অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে ওরা বার-কাউণ্টারের পাশ দিয়ে সোজা সিঁড়ির দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

প্রথমে দোতলা, তারপর তিনতলা। ডিকির নিজস্ব এই বাড়ির সব তলাই ফাঁকা। নিঝুম থমথমে ঘরগুলো পেরিয়ে নির্লিপ্ত ডিকির পেছন পেছন গম্ভীর অলক কোণের একটা নিস্তব্ধ ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরটা তালাবন্ধ।

ডিকি কোটের পকেট থেকে চাবি বের করতে করতে বলল, বেশিক্ষণ হয়নি ও এখানে এসেছে। তবে তুমি একটু আগে এলে ভাল করতে। বলতে বলতে ডিকি ঘরে ঢুকে কথাটা শেষ করল—কারণ, ছোটেলাল তখনো বেঁচেছিল। অন্ধকার ঘরটায় আলোর সুইচ টিপল ডিকি।

অলক একটু থমকে দাঁড়াল। সামনে একটা টেবিলের ওপর ছোটেলালের বিকৃত লাশটা পড়ে আছে।

কোমরে হাত দিয়ে দেখল অলক, সারা শরীরে ছোরার আঘাতের অজস্র চিহ্ন। ডান হাতের পাঁচটা আঙুলই কাটা। গলার কাছেও একটা বীভৎস গর্ত, শার্টের রক্ত তখনো শুকোয় নি। তবে ও আঁতকে উঠল ছোটেলালের ঠোঁট দুটো দেখে। মুখে ওগুলো ঝুলছিল। বোঝা গেল বেশ ধারালো কাঁচি দিয়ে কাটা হয়েছে।

মিনিটখানেক তার ওপর চোখ বুলিয়ে অলক ঘুরে দাঁড়াল।

—এবার বুঝতে পেরেছ, আজকের কাজে ওকে গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র কাজ কেন দিতে বলেছিলাম ?

মাথাটা ঈষৎ দোলাল অলক। তারপর ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আবার তালা লাগাল ডিকি।

অলক ওর ভাবলেশহীন মুখের দিকে গভীর দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ও বুঝতে পারল। ছোটেলাল যে তিন লক্ষ টাকার ক্যাশবাক্স নিয়ে বিশ্বাসঘাতকা করতে গিয়েছিল সেটা ও জানল এখন। কিন্তু ও বুঝতে পারল না যে ডিকি ওকে এত তাড়াতাড়ি ধরতে পারল কি করে।

ডিকি তালা লাগিয়ে তিনতলার আর একটা ঘরে এসে ঢুকল। এই ঘরটা ব্লু-ক্যাসলের অফিস ঘরের প্রতিকল্প। অর্থাৎ গুপ্তসভা ও ডিকির

নানা রকম লেনদেন করার জায়গা। এই ঘরেও লাল কার্পেট পাতা। দামী সোফা-কোচ দিয়ে ড্রয়িং-রুমের মত সাজান। তাছাড়া ভল্ট ও স্টীলের একটা আলমারি আছে। এখানেও কোণের একটা টেবিলে দুটো ফোন।

ঘরে ঢুকে ডিকি সোজা আলমারীর কাছে গেল।

—বস, অলক। আলমারী থেকে স্কচ হুইস্কির বোতল বের করতে করতে বলল ডিকি, তুমি মনে করোনা যে ছোটেলালের লাশ দেখানোর জন্য তোমাকে ডেকেছি আমি। একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে তোমার সঙ্গে। কথাটা আজ রাতের মধ্যেই সেরে নিতে হবে।

দুটো গ্লাস ও বোতল নিয়ে ডিকি অলকের পাশের একটা কোচে গিয়ে বসল। —আজকের ব্যাঙ্কের কাজটার জন্য তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কারণ তোমার প্ল্যানটার জন্যেই আমরা আজ একজন বিশ্বাসঘাতককে আবিষ্কার করতে পারলাম। হুইস্কির একটা গ্লাশ এগিয়ে দিল ডিকি।

—ছোটেলালকে তোলা হল কোত্থেকে? গ্লাশটা হাতে নিয়ে অলক প্রশ্ন না করে পারল না।

—বেশি দূর যেতে পারে নি। ওর গাড়িটা যখন এণ্টালী পেরিয়ে সোজা দমদমের দিকে ঘুরল তখন আমার লোক ওকে তোলে বেলেঘাটা ভি. আই. পি-র মোড় থেকে।

—তুমি কি জানতে? অলক গ্লাশে চুমুক দিয়ে ডিকির চোখের দিকে তাকাল।

—ছোটেলাল এরকম কাজ কোন না কোনদিন করবে জানতাম। আর সেজন্যে ওর প্রতিটি কাজে আমার লোক ওকে ফলো করত। ধরা দিল ও আজ।

'আমার লোক' কথাটার তাৎপর্য বুঝতে পারল অলক। অর্থাৎ ডিকির দলের স্পেশাল ফোর্সের সদস্য এরা—ডিকির ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষক হয়ে যারা প্ল্যান অনুযায়ী অনেক কাজেই পরোক্ষ ভাবে থাকে। এই সব লোকেদের অলক বা দলের অন্য কারো চেনার কথা নয়। তবে এরা যে কত দক্ষ ও সাংঘাতিক খুনী তার প্রমাণ একটু আগেই পাওয়া গেছে। কারণ, এটা জানা কথা, ছোটেলালের জীবিত অবস্থায় ওর ওপর যে সব আঘাত করা

হয়েছে তার একটাও ডিকি নিজে করেনি। তাছাড়া এটাও জানত অলক যে ডিকির দলের প্রত্যেককে ছোটেলালের এই লাশ দেখান হবে। বিশ্বাস-ঘাতক যে ডিকির কাছ থেকে বাঁচতে পারে না আর তার মৃত্যু কতটা যন্ত্রণা-দায়ক হতে পারে তার উদাহরণ সবার সামনেই ও তুলে ধরবে।

তবে ছোটেলাল সম্বন্ধে ডিকির সঠিক অনুমান ওতাকে হাতে-নাতে ধরার এই পরিকল্পনার প্রশংসা না করে পারল না অলক।

—তোমাকে আমি যে জন্য খুঁজছি, একটা ছোট্ট বিরতির পর ডিকি চেয়ারে আরো সোজা হয়ে বসল। তারপর কোন ভূমিকা না করেই কথাটা পাড়ল—একটা মেয়েকে খুন করতে হবে।

অলকের গ্লাশের হুইস্কি চলকে উঠল। হাত থেকে ও গ্লাশটা নামিয়ে রাখল।

—অবশ্য খুন করবে আর একজন, তুমি শুধু সাহায্য করবে।

—মেয়েটি কে?

—একজন ক্যাবারে ড্যান্সার। ডিকি ওর স্বভাব-সুলভ সহজ ভঙ্গীতে বলল, অবশ্য ক্যাবারে ড্যান্সার না হয়ে সে কল-গার্লও হতে পারত। তবে আমি একজন ক্যাবারে ড্যান্সারকেই ঠিক করেছি। মগনলাল-ছগনলালের নাম শুনেছ?

—বম্বের বিখ্যাত কোটিপতি?

—হ্যাঁ। ওদের এখানেও অনেক বিজনেস আছে। মগনলাল সুরায়েকা আর ছগনলাল সুরায়েকা দু ভাই। এর মধ্যে এখন শুধু মগনলাল বেঁচে আছে। মগনলালের একটি ছেলে নাম প্রদীপ, ছগনলালেরও একটি ছেলে নাম দীপক। এইটুকু বলে ডিকি উঠে দাঁড়াল। তারপর কোণের আলমারীর দিকে এগিয়ে গেল। আলমারী থেকে ছোট একটা কাগজের টুকরো নিয়ে ফিরে এল।

—এটা পড়। টুকরোটা অলকের হাতে দিয়ে ডিকি আবার বসল।

অলক দেখল, খুবই পুরনো খবরের কাগজের একটা ছোট কাটিং। কালি দিয়ে দাগ মারা দু তিন লাইনের একটা খবর।

বিখ্যাত কোটিপতির ছেলে যৌন-উন্মাদ

বোম্বাই, ২০শে ডিসেম্বর, স্থানীয় জুহু এলাকার একটি হোটেলে বোম্বাই-এর এক কোটিপতির ছেলেকে তার শয্যাসঙ্গিনীকে আঘাত করার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনায় প্রকাশ, ঘুমন্ত শয্যাসঙ্গিনীর বিশেষাঙ্গ ধারালো অস্ত্রের দ্বারা কর্তন করার সময় তার আর্ত চিৎকারে হোটেলের অন্যান্য বাসিন্দাদের কাছে সে হাতেনাতে ধরা পড়ে। তারপরেই তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়। মেয়েটিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

অলকের পড়া শেষ হলে ডিকি কাগজটা ফিরিয়ে নিল।

—খবরটা সংক্ষিপ্ত, আজ থেকে ছ বছর আগে বোম্বের একটা সাপ্তাহিকে বেরিয়েছিল। কাগজটা টেবিলের ওপর অ্যাশট্রের নীচে রেখে বলল ডিকি।—কোটিপতি বলেই নামটা বেরয়নি তখন। এই ছেলেটির নাম দীপক সুরায়েকা। মৃত ছগনলাল সুরায়েকার একমাত্র ছেলে। আর যে শয্যাসঙ্গিনীর উল্লেখ দেখলে সে হচ্ছে বোম্বের এক উঁচুদরের কলগার্ল। ডিকি বোতল থেকে গ্লাশদুটোতে হুইস্কি ঢেলে বলতে শুরু করল।—দীপক কুড়ি বছর বয়েস থেকেই এরকম জীবন যাপন করতে শুরু করে। মেয়ে আর মদ ছাড়া ওর তখন অন্য কোন চিন্তা ছিল না। এরই ভেতর চব্বিশ বছর বয়েসে একটা পাগলামির লক্ষণ দেখা দেয়। তবে সেটা কখনই বেশিক্ষণ থাকত না। আমার মনে হয় এটা ওর সাময়িক মানসিক অসুস্থতা। তুমি যে ওর এই খবরটা পড়লে এটা ওর জীবনে এ ধরনের দ্বিতীয় ঘটনা। তার আগেও একজন বাইজীরও প্রায় এরকম অবস্থা করে ফেলেছিল। কিন্তু সেটা পুলিস কেস হয় নি। তার কারণ, দীপকের বাবা প্রচুর টাকা দিয়ে সেই সামান্য আহত মেয়েটির মুখ বন্ধ করতে পেরেছিল। একমাত্র জুহু হোটেলের এই কেসে দীপক ধরা পড়ে। আর তাতেই তিনশো ছাব্বিশ ও তিনশো চুয়ান্ন আই. পি. সি-তে ওর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু যখন দেখা গেল দীপক মানসিক বিকারগ্রস্ত যুবক তখন ওর বিচারের ধারা পালটে যায়। শেষ পর্যন্ত ওকে লুনেটিক প্রিজনার

হিসেবে একটা উন্মাদ আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে ও বছর-খানেক ছিল। তারপর ছগনলাল ওকে আশ্রমের সুপারিশ অনুযায়ী ভিয়েনার এক মেণ্টাল হসপিটালে চিকিৎসার জন্য পাঠাতে সমর্থ হয়।

অলক হাতের গ্লাশটা টেবিলের ওপর রেখে পায়ের উপর পা রাখল। ডিকি ওর গ্লাশের হুইস্কি শেষ করে আবার বলতে শুরু করল।—সে সময় ছগনলাল সুরায়েকা দীপকের উনত্রিশ বছর বয়েসে মারা গেল। মৃত্যুর আগে সে ছেলের ঐ অবস্থা দেখে ব্যবসার সমস্ত অংশ মগনলালের নামে লিখে দিয়ে গেল। সেই সঙ্গে নিজের ভাইকে নির্দেশ দিয়ে গেল যে যদি কোনদিন দীপক সুরায়েকা মানসিক সুস্থ হয় ও তারপর যদি সে সৎপথে চলে তাহলেই যেন তাকে তার প্রাপ্য অংশ দিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, ডিকি নিজের কথায় জোর দিল এবার, অবস্থা যদি একই থাকে তাহলে মগনলাল ছগনলাল কোম্পানীর ভবিষ্যতের একমাত্র উত্তরাধিকারী হবে প্রদীপ সুরায়েকা। ডিকি আবার ওর স্বর নামাল, কিন্তু অবস্থা এখন সেরকম নেই।

অলক ঝুঁকে ওর গ্লাশটা উঠিয়ে নিল। ডিকির কথার ধরণ দেখেই ও বুঝতে পারল কাজটা কার। গ্লাশে চুমুক দিয়ে এতক্ষণ পর ও বলল, তার মানে দীপক সুরায়েকা এখন সুস্থ?

ডিকি মাথা ঝাঁকাল। অ্যাশট্রের ওপর থেকে পাইপটা উঠিয়ে নিয়ে বলল—হ্যাঁ, ওকে ভিয়েনার হাসপাতাল থেকে সুস্থ করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ছ মাস হল ইণ্ডিয়াতে ফিরে এসেছে। এখানেও এই ছমাস ওকে নজরে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সবাই লক্ষ্য করেছে দীপক নাকি সত্যি বদলে গেছে। মেয়ে-মদের দিকে ওর আর একদম আসক্তি নেই। মগনলাল তাই ভাবছে অচিরেই দীপকের প্রাপ্যটুক ওকে ফিরিয়ে দিতে। আমরা প্রদীপ সুরায়েকার কাছ থেকে একটা অফার পেয়েছি।

—বুঝলাম। অলক পায়ের ওপর পা রাখল। তা তুমি কি বলতে চাও, আমাদের কাজ দীপককে আবার উন্মাদ বলে প্রমাণ করা?

—শুধু উন্মাদ নয়, যৌন-উন্মাদ। এজন্য আমরা প্রদীপের কাছ থেকে পাব পুরো পাঁচ লাখ টাকা। তারমধ্যে দু লাখ অ্যাডভান্স, বাকী তিন

আখ কাজটা হবার পর।

—কাজটা কি ?

—সে ধরনেরই একটা মেয়ের সঙ্গে ওকে জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত সেই মেয়েটিকে এমনভাবে খুন করা যাতে পুলিস সহ সবাই বোঝে দীপকের বিকৃত যৌন লালসার শিকার হয়েছে সে। ও যে আদৌ সেরে ওঠেনি সেটা সবাইকে জানাতে হবে।

অলক কিছুক্ষণ নীচের দিকে তাকিয়ে, কোচে নড়ে-চড়ে বসল। তারপর যেন একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলল—কিন্তু ডিকি, তুমি এই বললে যে দীপক আর সে দীপক নেই। তাহলে আমরা কি করে আশা করতে পারি যে সে ধরনের মেয়ের সঙ্গে ওকে আমরা জড়াতে পারব ?

—ঠিকই বলেছ। ডিকি নেভান পাইপটা জ্বালিয়ে নিয়ে বলল, দীপক যে এখন কোন বাজারী মেয়ের সঙ্গে ভিড়বে না সেটা সত্যি। কিন্তু ধরো যদি সে মেয়েকে আমরা সমাজের কোন উঁচুদরের মহিলা হিসেবে তার কাছে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে ?

অলক ডিকির চোখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল।

আবার বলল ডিকি—তাহলে দীপকের সেই মেয়ের সঙ্গে ভাব করতে আপত্তি নাও থাকতে পারে। দীপক যে ভাব করতে এগিয়ে আসবে সেটা নির্ভর করবে আমাদের মেয়ে নির্বাচনের ওপর। কাজটা আমাদের সেখান থেকেই শুরু। আর সেটা আমি ইতিমধ্যেই তোমার জন্য করে রেখেছি।

এত কথার পরও অলক কিছু বলল না। বড় একটা গল্প শোনার মত ভঙ্গী করে ও চুপ করে বসে রইল।

ডিকিই বলে গেল ওর কথা—তার মানে বুঝেছ ? মেয়ে ঠিক করা আছে। এমন একটি মেয়ে, আমার মনে হয়, যার সংস্পর্শে এলে দীপক কিছুতেই নিজেকে সামলে রাখতে পারবে না। অথচ মেয়েটি যে সত্যি সত্যি একটা বাজারে মেয়ে এ ঘটনাটুকু দীপকের কাছে গোপন থাকবে। কারণ, মেয়েটার এই পূর্ব ইতিহাসটা পরে কাজে লাগাতে হবে। এখন তোমার প্রথম কাজ সেই মেয়েটিকে দীপকের মনোরঞ্জনের অভিনয়ের জন্যে নামতে রাজী করান।

—ঘটনাটা ঘটবে কোথায় ?

—রানীক্ষেতে। ফিফ্‌টিন্থ অক্টোবর থেকে পনের দিনের জন্য দীপক সেখানে বিশ্রাম নিতে যাচ্ছে। তার মানে আর সাত দিন মাত্র বাকী। এর মধ্যে মেয়েটাকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মোটমাট আট ন' দিনের জন্য ওকে ওখানে চাই। এ জন্য তুমি মেয়েটির সঙ্গে সুবিধে মত কথা বলে একটা অফার দিতে পার। তবে ও শুধু জানবে না—

—যে শেষপর্যন্ত ও ওখানে খুন হবে। অলক টেবিলের ওপর হুইস্কির খালি গ্লাশটা ঘসতে ঘসতে ডিকির কথাটা শেষ করল, কিন্তু খুনটা করবে কে ?

—পৃথ্বিরাজ। তবে এমন ভাবে ও এমন অবস্থায় খুনটা হবে যাতে খুনী হিসেবে ধরা পড়ে দীপক সুরায়েকা।

—তার মানে, পৃথ্বিরাজকেও সেখানে থাকতে হচ্ছে ?

—নিশ্চয়। তবে মেয়েটির সঙ্গে নয়। ওখানে ওকে অন্যান্য ট্যুরিস্টদের মতই থাকতে হবে। কি ভাবে থাকবে সেটা আমাদের পরিকল্পনা মত ঠিক করে নেব। তবে মেয়েটি থাকবে দীপক সুরায়েকার বাংলোর পাশের কোন বাংলোতে। দুজনের মধ্যে মোটামুটি একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর সে খুন হবে। যেহেতু পৃথ্বিরাজ ওর সঙ্গে ওখানে কোন যোগাযোগ রাখছে না, সেজন্যে এই খুনের পর আমরা পুলিস বা অন্য কারোর দৃষ্টিতে পড়বো না, এটা অবধারিত। তবে সাবধান হতে হবে এখানে। মেয়েটির সঙ্গে এখানে তুমি যে যোগাযোগগুলো করবে তার সাক্ষী তুমি আর সে ছাড়া আর কেউ যাতে না হয় সে খেয়াল তোমায় বিশেষ করে রাখতে হবে। ডিকি উঠে দাঁড়াল। আবার আলমারীর দিকে পা বাড়াতেই অলক বাধা দিল।

—একটা কথা, ডিকি।

—ইয়েস ?

—মেয়েটিকে খুন না করেও ত দীপককে উইল থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে, কারণ তুমি যা বললে তাতে বোঝা যাচ্ছে, দীপক সুস্থ অবস্থায় লম্পট হিসেবে প্রমাণিত হলেও সে তার অংশ পাবে না।

ডিকি তার পাইপে কয়েকটা ঘন ঘন টান দিল।—তা অবশ্য হতে পারে, ভরাট স্বর নিয়ে বলল তারপর, তবে মেয়েটি বেঁচে থাকলে সেটা যে অভিনয় তা ফাঁস হয়ে যাবার বিপদও থেকে যাবে তার সঙ্গে। আর সে অবস্থায় দীপকের দিক থেকেও বলার অনেক কিছু থাকতে পারে। কিন্তু দীপকের হাতে বিকৃত যৌন সুখের জন্য মেয়ে খুন, এটা পুলিসের মেনে নিতে খুব অসুবিধা হবে কি? কারণ ওর জীবনে এ ধরনের দু-দুটো ইতিহাস রয়ে গেছে। তাছাড়া, আর একটা কথা, ডিকি একটু থেমে বলল, একটা মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রদীপ সুরায়েকা নিশ্চয়ই আমাদের পাঁচ লাখ টাকা দিতে যাবে না।

ডিকি আর দাঁড়াল না, আলমারীর দিকে এগিয়ে গেল। অলক সিলিং-এর দিকে তাকাল।

কিছুক্ষণ পর একটা নোটের তোড়া নিয়ে ফিরে এল ডিকি। পাশের ম্যাগাজিন র‍্যাক থেকে আজকের কাগজটা উঠিয়ে বসল কোচে।

অলকের সামনে এনটারটেনমেন্টের পাতাটা খুলে হোটেল ক্যারো-লিনের বিজ্ঞাপনটা দেখাল—এই হচ্ছে আমাদের নির্বাচিত মেয়ে।

—গোল্ডী। বিজ্ঞাপনটা পড়তে পড়তে অলক উচ্চারণ করল।

—ওটা ওর পোশাকী নাম, আসল নাম শোভনা। আজ সারাদিন ধরে ওর সম্বন্ধে সব খবরাখবর নিয়ে রেখেছি! তোমার জন্য হোটেল ক্যারোলিনের ওনলি কর্নারে তাপস মুখার্জী নামে কালকের একটা টেবিল রিজার্ভ করা আছে। এই টাকাটা রাখো, গোল্ডী বাবদ আপাতত তোমার খরচা। নোটের তোড়াটা এবার এগিয়ে দিল ডিকি।

অলক হাত না বাড়িয়ে ডিকির চোখের দিকে তাকাল। ডিকি ওর মনের দ্বন্দ্ব বুঝতে পারল। নোটের তোড়াটা আবার টেবিলের ওপর রেখে ডিকি ঠোঁটে পাইপের আগাটা ঘসতে লাগল।—তুমি কি একটু ভেবে নিতে চাও?

অলক খানিকক্ষণ পর উত্তর দিল।—ভাবনাটা যে তুমি সেরে রেখেছ তা আমি জানি ডিকি। তবুও আমি বলব কাজটা একটু অন্য ধরনের হয়ে যাচ্ছে না? ব্যাঙ্ক-রবারী ও স্মাগলিং গুড্‌স্ পাচার করতে গিয়ে

কতকগুলো মৃত্যু অবশ্য আমাদের হাতে হয়েছে, কিন্তু সেগুলো অ্যাকশনের মৃত্যু। এই কাজে একটা মৃত্যু ঘটাবার জন্যে আমরা কজন বেশ কিছু সময় ধরে লেগে থাকব, রিস্কটা কি বেশী নেওয়া হচ্ছে না ?

—গুড্, ডিকি একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মাথাটা দোলাল, একটা কথা জেনে আমি খুশী হলাম যে কাজের চরিত্রটা তুমি বুঝতে পেরেছ। হ্যাঁ, সত্যি এ কাজের ঝুঁকি অনেক বেশী। তবে অলক, এই ঝুঁকির অন্যদিকে আছে আমাদের দক্ষতা ও যোগ্যতা। যদি গোটা কাজে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্ল্যান করে এগোই তাহলে আমার মনে হয় ঝুঁকির ধারটা অনেক কমে যাবে। তাছাড়া, এ ধরনের কাজ যে আমরা করিনি তা নয়। তবে আমাদের দলে যারা সেগুলোর ভার নিয়েছিল তাদের সংখ্যা খুব কম, আর তাদের বয়েসও হয়েছে এখন। কথাটা বলে ডিকি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ডিকির নিস্পৃহ কঠোর মুখটার দিকে তাকিয়ে অলক আরো একবার ওর বয়েস পরিমাপ করার চেষ্টা করল। ধরা পড়ে যাওয়ার একটা সলজ্জ ভাব করে ডিকি আবার ওর বিষয়ে ফিরে এল—যা বলছিলাম, বর্তমানে এ কাজের জন্য তোমাকেই আমার সবচেয়ে উপযুক্ত মনে হয়। কাজটা সত্যি খুব কঠিন, তবে এতে থ্রিল আছে।

অলকের কপালের আবছা ভাঁজগুলোতে ডিকির কথার কোন প্রভাবই পড়লনা। তবু ও জিজ্ঞেস করল—গোষ্ঠী সম্বন্ধে আর কি জেনেছ তুমি ?

—ক্যাবারে লাইনে সবে নেমেছে। আগে ভাল ক্লাসিকাল ড্যান্স করত। ওর আপনজন বলতে একমাত্র মা। সে-ও কয়েকদিন ধরে মানিকতলার এশিয়া নার্সিং হোমে শয্যাগত। বলেই ডিকি নোটের তোড়াটা কোটের পকেটে ঢুকিয়ে নিল—যাই হোক, এক্ষুনি তোমায় বলতে হবে না। রাত এগারটার সময় তুমি আমায় ফোন কোরো। এই কাজে নামতে হলে তোমার একটু ভাবা দরকার। তবে আজ রাতের মধ্যেই জানাতে হবে। কারণ একটা কাজে আশী হাজার টাকা পাওয়ার মত যোগ্য লোক খোঁজার সময় চাই। ডিকি উঠে দাঁড়াল।

অলককে বিদায় দিয়ে ডিকি আবার সোফায় এসে বসল। টেবিলের

ওপর খবরের ছোট্ট কাটিংটা ও আজকের কাগজটা ছিল। একটায় দীপক সুরায়েকার খবর আর একটা গোল্ডীর বিজ্ঞাপন। কাটিংটা হাতে নিয়ে বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি রাখল ডিকি। তারপর কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে পকেট থেকে লাইটার বের করল। লাইটারের শিখায় কাটিংটা জ্বালিয়ে ছাই করে অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল। খবরটার আর দরকার নেই। যাকে দেখানোর জন্য ওটা আনানো হয়েছিল তাকে দেখানো হয়ে গেছে। আর সে যে এই কাজের ভার নিতে রাজী তাও মনে হল ডিকির। যদিও ওর পাকাপাকি সিদ্ধান্তটা পাওয়া যাবে রাত এগারটার সময়।

ডিকি উঠে দাঁড়াল। ধীর পায়ে ভাবতে ভাবতে জানলার দিকে এগিয়ে গেল। হঠাৎ ওর চিন্তায় এল, যদি শেষ পর্যন্ত অলক রাজী না হয়? ডিকি গভীর শ্বাস নিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। তাহলে অবশ্য পাঁচ লাখ টাকার এই কাজ ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ যে তুজনের উপর নির্ভর করে ডিকি এই কাজ হাতে নেওয়ার কথা ভাবছে তার মধ্যে অলক অপরিহার্য। ওকে ছাড়া এই কাজের কথা ভাবা যায় না।

ডিকি আবার অস্থির হয়ে সোফায় বসল। এবার ও অলকের কথা ভাবল মনে মনে। অলক শিক্ষিত ছেলে। ওর কোন আবেগ নেই। শিহরণময় জীবন-যাপন করতে ও ভালবাসে। যে সমস্ত কাজে বিরাট ঝুঁকি, এমন কি জীবন সংশয়েরও আশঙ্কা থাকে, ডিকি দেখেছে সে সব কাজে অলক খুব আনন্দের সঙ্গে এগিয়ে গেছে। অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি ওর এই তীব্র নেশা ওকে প্রচণ্ড তুঃসাহসী করে তুলেছে। আরও একটা বড় সম্পদ ওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর ব্যক্তিত্ব। কাজ যত কঠিন, অলক তত একরোখা বেপরোয়া। এ পর্যন্ত ও কোন কাজে ব্যর্থ হয়েছে বলে ডিকির মনে এল না। সেই অলক এ কাজ নিতে পিছপা হবে ডিকির তা বিশ্বাস হয় না। নিজের নেশার জন্য ও আনন্দের জন্য অন্তত এই কাজ নিতে ও বাধ্য।

তবে অলকের একটা অসুবিধেও আছে। ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে ও এখনো পারে না। সেটা নিয়ে অবশ্য ডিকি এখন ভাবছে না। কারণ এই কাজে খুনের জন্য ওদের দলে ভাল লোক আছে। তার নাম পৃথ্বিরাজ। পৃথ্বিরাজ পাকা খুনী। দয়া-মায়া আবেগটাবেগের ধার সে ধারে না।

ভয়ংকর নিষ্ঠুর ভাবে খুন করতে সিদ্ধহস্ত। খুনের ধারে কাছে কোন সূত্রও কখনো ভুল করে ফেলে আসে না। নিখুঁত খুনের জন্য পৃথ্বিরাজের জুড়ি নেই। খুনের পর পৃথ্বিরাজের টিকিও কেউ কোনদিন ছুঁতে পারে না। তাছাড়া, ডিকি জানে, মেয়ে খুনের ব্যাপারে ও আলাদা যত্ন নেয়।

মোট কথা অলকের যেটুকু ফাটল, পৃথ্বিরাজ তা ভরাট করে দিয়েছে। দুজন যদি এক সঙ্গে এই পাঁচলাখ টাকার কাজটায় নামে, তাহলে যে কাজ হাঁসিল হবে ডিকি নিশ্চিত। এখন শুধু রাতের ফোনের অপেক্ষায় থাকা।

ব্লু-ক্যাসল থেকে বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল অলক। ডিকির নতুন কাজের কথা ভাবতে ভাবতে ওয়েলিংটন স্ট্রীটের রাস্তা ধরে অনেক দূর হেঁটে এসেছিল। শেষ পর্যন্ত রিপন স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের গলিটা পেরোলেই ফ্রি স্কুল স্ট্রীট। ওদিকে গিয়ে ইনটেরিয়র বারে আরো হুইস্কি খেয়ে মাথার চিন্তাটাকে তরল করবে কিনা ভাবল অলক। নাকি নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে নতুন কাজটাকে আরো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাববে তাও এক বার মনে এল। ওর ফ্ল্যাট আর একটু এগিয়ে এলিয়ট রোডের ওপর। কিন্তু কোন দিকেই ও পা বাড়াল না। তার বদলে একটা ট্যাক্সি ডাকল। আপাতত ওর সোহনলালের ডেরার দিকে যাওয়াটাই ভাল।

ওর যা কোনদিন হয়নি এই প্রথম অলক দ্বিধাগ্রস্ত, বিচলিত। ডিকির নতুন কাজের বর্ণনা শুনে এ কাজে হাত দিতে ও মনের ভেতর থেকে কোন সমর্থন পাচ্ছে না। কিন্তু অলক জানে যে কাজটা ওকে দেওয়া হবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েই ডিকে ওকে সব কিছু বিশদভাবে বলেছে। অথচ কাজের চরিত্রটা অলকের মোটেই পছন্দ হচ্ছে না।

অলক কাজ বলতে বোঝে গতি আর তৎপরতা। জালিয়াতির কোন ব্যাপারে ও কখনো উৎসাহ পায় না। যেটা এই কাজে বেশি মাত্রায় আছে। একটি মেয়ের হত্যাকে কেন্দ্র করে শুধু মিথ্যের জাল ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে অলক কোন শিহরণ খুঁজে পেল না। যদিও পারিশ্রমিক হিসেবে ডিকি যা ইজত করেছে, সেটা ওর কল্পনার বাইরে। তবে টাকাটা অলকের কাছে সব সময় বড় নয়। যে কাজে ও আনন্দ পায় সে কাজে

টাকা কম পেলেও ওর চলে।

অবশ্য এ ধরনের কাজ ডিকির দলে হামেশাই হচ্ছে। সেগুলোতে এত বিরাট পরিকল্পনা বা এত টাকার আমদানি না থাকলেও ডিকির দলের প্রত্যেকেই একটা না একটা চিটিং কেস বা ব্ল্যাকমেলিং নিয়ে প্রায়ই ব্যস্ত থাকে—একমাত্র অলক ছাড়া।

অলক এখন পর্যন্ত বড় ডাকাতি, বর্ডারে দামী মাল পাচার আর ব্যাঙ্ক-রবারী ছাড়া অন্য ধরণের কোন কাজে নিজেকে জড়ায় নি। তবে সেরকম কাজে ওর যে দু-একবার ডাক পড়ে নি তা নয়। কিন্তু কায়দা করে অলক সেগুলো সব সময় এড়িয়ে গেছে। অবশ্য ডিকিকে ও কখনো বুঝতে দেয়নি যে সব কাজে ওর মন সায় দেয় না। কারণ অলক জানে ডিকির দলে থাকতে হলে সব রকম কাজ ওকে একদিন না একদিন করতেই হবে। আর ডিকির দলে থাকতেও হবে ওকে সারা জীবন।

ভাবতে ভাবতে অলক একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। প্রায় সাত বছর আগেকার কথা মনে পড়ে গেল ওর।

সুদূর লুধিয়ানা থেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে কলকাতায় এসে একদিন এই ডিকির কাছে ওকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। ডিকি যদি সেদিন ওকে আশ্রয় না দিত তাহলে আজ ও বেঁচে থাকত কিনা সন্দেহ।

অনাথ অলকের ছোটবেলা কেটেছে লুধিয়ানাতে। মা-বাবার কথা কোনদিনই ওর মনে পড়ে না। তাদের সঙ্গে নাকি ওর জন্মের পর থেকেই ছাড়াছাড়ি। বাবার সম্বন্ধে এইটুকু ও জানে যে লুধিয়ানাতে তিনি প্রবাসী বাঙালী ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে গিয়েছিলেন। চাকরি করতে করতে এক পাঞ্জাবী মেয়ের সংস্পর্শে আসেন তিনি। তাদেরই অবৈধ সন্তান অলক।

ঘটনাটা ঘটার পর তার বাবাকে নাকি স্থানীয় লোকেদের হিংস্র আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে রাতারাতি পাঞ্জাব ছাড়তে হয়। আর মা ওকে এক বান্ধবীর কাছে রেখে আত্মহত্যা করে।

তারপর থেকে অলকের জীবনে অনেক ঝড় ঝাপটা বয়ে গেছে। ছোটবেলা থেকেই ও ভীষণ ডানপিটে আর একরোখা। তবু মায়ের দরদী বান্ধবীটির দরুণ একটা ভাল অনাথাশ্রমে ভর্তি হতে পেরেছিল বলে অলক

স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে কলেজ পর্যন্ত এগিয়েছিল। অবশ্য এর মধ্যে ওর দৌরাত্ম্যের দাপটে অনাথাশ্রম ওকে দু-তিনবার তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু পড়াশুনায় ওর মেধা দেখে আবার ওকে গ্রহণও করা হয়েছিল।

কলেজজীবনে গিয়ে ও আরো বেপরোয়া হয়ে উঠল। সেখানে নানা ধরণের বন্ধু পেয়ে ওর দৌরাত্ম্য গুণ্ডামিতে পরিণত হল। কলেজ থেকে রাসটিকেটেড হল অলক। অনাথ আশ্রম থেকেও বিতাড়িত। তারপর আস্তে আস্তে ও লুধিয়ানার মস্তানদের একজন হয়ে ওঠে। অলকের দুর্জয় সাহস ও বুদ্ধি ওকে গুণ্ডামিতে দুর্ধর্ষ করে তোলে। মারপিট ও লুঠতরাজে তখন ও কাউকে পরোয়া করত না।

সে সময় লুধিয়ানার জাত গুণ্ডা অওতার সিংয়ের সঙ্গে ওর মুখোমুখি হয়। অওতার সিং প্রথম থেকেই অলকের উঠতি অবস্থাকে ভাল নজরে দেখে নি। লোকটা ছিল জঘন্য চরিত্রের আর ওখানকার গুণ্ডাদের শিরোমণি।

শেষ পর্যন্ত যখন অওতার সিং বুঝতে পারে যে অলককে আর বাড়তে দিলে ওর বাজার খারাপ হয়ে যাবে তখন ও অলককে খুন করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। এজন্য সে ভয় ও প্রলোভন দেখিয়ে অলকের দলের কয়েকজনকে ভাঙিয়ে নিতে সমর্থ হয়।

তারপর সুযোগ বুঝে এক রাতে তার দলের লোকেরা ওকে খতম করার জন্য ওর আস্তানায় হামলা করবে বলে ঠিক করে। কিন্তু অলক সবকিছু টের পেয়ে প্রথম থেকেই সাবধান ছিল। সেই দল এসে পড়ার আগেই ও আস্তানা থেকে পালিয়ে যায়। ও বুঝতে পেরে ছিল এ অবস্থায় ওকে লুধিয়ানা ছাড়তে হবে। কিন্তু ও জানত না যে অওতার সিং-এর জল্লাদেরা ওকে কলকাতা অবধি ধাওয়া করবে। নিজের এলাকার প্রতিদ্বন্দ্বীকে অওতার সিং একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চেয়েছিল। ওর ভয় ছিল অলক ওর দলের অবশিষ্ট ছেলেদের নিয়ে আবার হয়ত লুধিয়ানাতে একদিন আসর জাঁকাবে। তাই সেদিন ওদের হাতে অলকের মারা যাবার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা হল না। ডিকির আস্তানায় এসে ও রক্ষা পেয়ে গেল। ডিকি সেদিন সেই জল্লাদের হাত থেকে ওকে বাঁচিয়ে

ছল। এজন্য ডিকির কাছে ও কৃতজ্ঞ।

সেই ডিকি আজ যেভাবে অলকের কাছে নতুন কাজের এই প্রস্তাবটা রাখল তাতে সত্যি সত্যি অলক এখন বেশ বিব্রত বোধ করল। অর্থাৎ প্রস্তাবটা যদি ডিকি না করে অন্য কেউ করত, তাহলে অলকের ভাবনা ছিল না। ও স্রেফ না করে দিতে পারত।

তাছাড়াও অলক জানে ডিকির দলে থেকে ওর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে না বলার অর্থ কি। এর একটা জ্বলন্ত উদাহরণ সে এইমাত্র দেখে এসেছে।

দোটানা মন নিয়ে অলক সোহনলালের ডেরায় এসে উপস্থিত হল।

সোহনলাল তখন ঘরে একা। বাইরে বেরনোর জন্য পোশাক পরতে ব্যস্ত।—ব্যাপার কি? এতক্ষণ ব্লু-ক্যাসলে।

—হ্যাঁ, ডিকির সঙ্গেই ছিলাম। অলক ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে বসে পড়ল। —তুমি যাচ্ছ কোথায়?

—ডিকির কাছেই।

—ও, ছোটেলালকে দেখতে। অলকের স্বর একটু কেঁপে গেল। তারপর ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি এনে জিজ্ঞেস করল—কিন্তু ওরা কোথায়? ওদের ডাক পড়েনি?

—পৃথ্বিরাজ ও গুলসন? সোহনলালও হাসল।—ডিকিকে চিনতে ওদের একটু দেরী আছে। ছোটেলালকে খুঁজতে বেরিয়েছে ওরা।

—তার মানে? অবাক হল অলক। ডিকির ফোন তোমরা আগে পাও নি?

—তার আগেই ওরা বেরিয়ে গেছে। ছোটেলালের জন্যে ছুটো অবধি অপেক্ষা করে পৃথ্বিরাজটা ক্ষেপে গিয়েছিল। সোহনলাল টাই-এর নট শক্ত করে বেঁধে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর অলকের দিকে তাকিয়ে ভরাট স্বরে বলল, উজবুকটা ভেবেছে ডিকির আগেই ছোটেলালকে পাকড়াও করবে।

ডিকির প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার ওপর সোহনলালের পূর্ণ বিশ্বাস দেখে অলক থমকে গেল। ও ভেবেছিল ডিকির নতুন কাজ নিয়ে ওর সঙ্গে একটু আলোচনা করবে, কিন্তু সোহনলালের তৃপ্ত মুখের দিকে তকিয়ে ও আর সাহস পেল না।

বেরিয়ে যাওয়ার আগে সোহনলাল জিজ্ঞেস করল—তুই কতক্ষ আছিস এখানে ?

—এখন কোথাও বেরুচ্ছি না। অলক চেয়ার থেকে উঠে শার্ট খুলতে খুলতে বলল। —আমার একটু বিশ্রামের দরকার।

সোহনলাল একবার আড় চোখে ওর দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

প্রায় দু ঘণ্টা পরের কথা। অলক এক বোতল হুইস্কি প্রায় শেষ করে এনেছে। কিন্তু ডিকির নতুন কাজ নিয়েও তখনো কিছু ভেবে উঠতে পারেনি। এমন সময় ঘরের দরজায় কয়েকটা চাপড় পড়ল।

অলক গ্লাশ হাতে এগিয়ে গেল সেদিকে।

দরজা খুলতেই পৃথ্বিরাজ ও গুলসন হাঁপাতে হাঁপাতে ধড়মড় করে ঘরে ঢুকল। অলককে দেখে ওরা দুজনে থমকে দাঁড়াল। পৃথ্বিরাজ ঘোলাটে চোখ নিয়ে এগিয়ে এল ওর দিকে।—আচ্ছা, সোনার চাঁদ এখানেই আছো। কিবে তোর জুড়িদার কোথায় ?

অলক কোন জবাব দিল না। গম্ভীর ভাবে টেবিলের কাছে এসে গ্লাশে হুইস্কি ঢালতে লাগল। পৃথ্বিরাজ ও গুলসন ওর দুপাশে এসে দাঁড়াল। দুজনেরই অবস্থা মাতাল নেশাখোরের মত।

—কিবে, জবাব দিচ্ছিস্ না যে ? পৃথ্বিরাজ কোমরে হাত রেখে খরখরে গলায় বলে উঠল, টাকার পেটি কোথায় ?

—ডিকির কাছে। অলক নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিল। একটু সবুর করে বেরুলেই পারতিস। খবরটা এখানে অনেক আগেই এসেছিল।

—কিসের খবর ? গুলসন হেঁচকি তুলে জিজ্ঞেস করল।

—ছোটেলাল পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

অলকের জবাব শুনে ওরা থ হয়ে গেল। একটু পরে পৃথ্বিরাজ মুখে বাঁকা হাসি এনে সুর করে বলল—বুঝলাম, তাহলে তোর জুড়িদার শেষতক গদর হয়েছে ?

—মুখ সামলে কথা বলবি, পৃথ্বিরাজ। অলক তীব্র বেগে ঘুরে

াড়াল।—জুড়িদার কি শুধু আমার ছিল?

—হাঁ রে শালা, তোরও। পৃথ্বিরাজও হুঙ্কার দিয়ে উঠল। টাকার পাটি নিয়ে তুই ওকে একা ভাগতে বলেছিস। তোর ইয়ার না হলে কাজটা কে একা করতে দিতিস্?

—কে গদ্দারি করবে আর কে করবে না সেটা মেপে দেখার যন্ত্র ছিল না আমার কাছে। অলকও ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল।—গদ্দারি ত তুইও করতে পারতিস।

—হাঃ। হাঃ। হাঃ পৃথ্বিরাজের বিকট অট্টহাসি সারা ঘরটাকে কাঁপিয়ে দিল।—আমরা তোদের মত পড়ালিখা বাবু নই রে। ভেবেছিস, সখ করে লুঠতরাজ করতে নেমেছি? উস্তাদের মার আর জেলের গরম হাওয়া খেয়ে আমাদের তাতা হয়ে গেছে। পৃথ্বিরাজ আর একটু এগিয়ে এসে অলকের বাঁ কাঁধে হাতের একটা ঝটকা দিল।—শালা আর কেন, গায়ে আঁচড় পড়ার আগে কেটে পড় বাপধন। একজন সখের বাবু ত কমতি হল। এর পর তুমিও কোন্দিন কেলো করে বসবে, জানি আমরা।

অলকের চোখের পাতা দুটো কেঁপে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে ওর মুখের ভাব বদলে কঠিন ইস্পাতের মত হয়ে গেল। পৃথ্বিরাজের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্লাশটা সজোরে টেবিলের ওপরে রেখে ওর কলার চেপে ধরল—কি বললি, সখের বাবু, তাহলে ত্যাখ সখের বাবু কাকে বলে? পৃথ্বিরাজ আর কিছু বলার আগেই ওর থুতনিতে একটা স্ট্রেট কাট বসিয়ে দিল অলক। পৃথ্বিরাজ পড়তে পড়তে সামলে নিল। তারপরেই ও ঝাঁপিয়ে পড়ল অলকের ওপর। অলক এবার হুক ঝাড়ল। এটাও কাটাতে পারল না পৃথ্বিরাজ। ওর মুখ থেকে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল। পৃথ্বিরাজ পিছিয়ে এল। অলকের দিকে ঝাপসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে কোমর থেকে বার করল ছুরিটা। সেটা আলোয় চকচক্ করে উঠল।

দুই জঙ্গীর লড়াই দেখে গুলসন দূরে সরে গিয়েছিল। একজন ক্ষ বক্সার। ওদের মাঝখানে গিয়ে লড়াই থামাবার সাহস হল না ওর। কিন্তু যখন ও দেখল হিংস্র পৃথ্বিরাজের লকলকে ছুরিটা অলকের কোমরের ওপর বিঁধতে বসেছে তখন ও চীৎকার করে উঠল। কারণ অলক তখন

পৃথ্বিরাজের আসুরিক শক্তির আঘাতে বেকায়দায় মাটিতে পড়ে গেছে গুলসন ছুটে পৃথ্বিরাজকে বাধা দিতে গেল। কিন্তু তার আগেই অলক নিজেকে সামলে নিয়েছে। ওর ডানপায়ের লাথি পৃথ্বিরাজের তলপেটে পড়তেই ছুরিটা অলকের বাঁহাতের কনুই-এর ঠিক ওপরে এসে বিঁধে গেল মুহূর্তে ফিনকি দিয়ে রক্ত উঠে অলকের সারা আস্তিনটা লাল হয়ে গেল।

আর ঠিক তখনই সোহনলাল ভেজান দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। ওদের দুজনের অবস্থা দেখে এক সেকেণ্ডের জন্য থমকে দাঁড়াল সে। তারপরেই সব বুঝতে পেরে পকেট থেকে পিস্তল বার করতে দেরী করল না।

—খবরদার, গর্জে উঠল সোহনলাল। উঠে পড়, এক সেকেণ্ড দেরী করলে দুজনেরই পায়ে গুলি ছুঁড়বো।

অলকের শক্ত মুঠিটা শিথিল হয়ে এল। দুজনেই টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। গুলসন সঙ্গে সঙ্গে অলকের রক্তাক্ত ক্ষতস্থানটা চেপে ধরল।

সোহনলালের ডেরা থেকে অলক যখন ওর ফ্ল্যাটে ফিরে এল তখন রাত একটা বেজে গেছে। দরজা খুলতেই ওর ঠিকে নেপালী চাকরটা ঘর পরিষ্কার করতে এল। অলক প্রায় প্রত্যেক দিন সকাল থেকে রাত অবধি বাইরেই থাকে। তাই চাকরটাকে রাতে ওর জন্য অপেক্ষা করতে হয়। ঘরে ঢুকে জামাকাপড় ছেড়ে নিল অলক। রোজকার মত রাতের স্নান সারতে বাথরুমে ঢুকল। বাঁ-হাতের কনুই-এর ওপর পৃথ্বিরাজের জখমটায় তখন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। হাতের টনটনে ব্যাথাটা একটু কমেছে। জখমটা কোন মতে বাঁচিয়ে অলক স্নান করতে করতে আজ পৃথ্বিরাজের সঙ্গে লড়াই-এর কথাটা ভাবতে লাগল।

এরকম ঘটনা অবশ্য একেবারে নতুন নয়। পৃথ্বিরাজের সঙ্গে এর আগেও কয়েকবার ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে, তবে হাতাহাতি থেকে রক্তারক্তিতে যাওয়া এই প্রথম। বছর চারেক আগে অলক যখন প্রথম ডিকির দলে এসেছিল, তখন পৃথ্বিরাজ ছিল ডিকির এক নম্বর কাজের লোক। ডিকির হয়ে নানা অ্যাকশনে ও দক্ষতার সঙ্গে খুন-খারাপি করত বলে ডিকির ছিল ও একমাত্র ভরসা। তারপর এল অলক। ওর আসার পর থেকে দলের কাজের ধারা পাল্টে গেল। অলকের ওপর ভরসা করে ডিকি নতুন

নতুন কাজের ভার নিল। আস্তে আস্তে পৃথ্বিরাজকে ডিঙিয়ে বলতে গেলে অলক এখন দলের কর্ণধার ডিকি ও তার সঙ্গী সোহনলালের সঙ্গে একই আসনে বসার মর্যাদা পায়। পৃথ্বিরাজের ঝালটা সেখানেই। অনেক পরে এসে দলে এভাবে ওর চড়চড় করে ওপরে উঠে যাওয়াটা পৃথ্বিরাজ সহ্য করতে পারে নি।

অলক সেটা জানত। কিন্তু তার পরিণতি এরকম একটা খুনোখুনি ডুয়েলে এসে পৌঁছবে, এতটা ও ভাবতে পারেনি। অলক এটাও জানে পৃথ্বিরাজ সাপের মত হিংস্র। পিশাচের মত খুন করে ও আনন্দ পায়। একেবারে জঘন্য লোকেরও যেটুকু চিন্তা ভাবনা থাকে সেটুকুও পৃথ্বিরাজের কাছ থেকে কল্পনা করা যায় না। অলক এটা জানে বলেই ভাবল, ভবিষ্যতে পৃথ্বিরাজের সঙ্গে খুব সতর্কভাবে চলতে হবে।

অলক বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। চাকরটা ঘর পরিষ্কার করে চলে গেছে। দু'টো বাজতে আর কয়েক মিনিট বাকী। বাইরের দরজা বন্ধ করে ও শোবার ঘরে ঢুকল। সারাদিনের ধকলের পর ডিকির নতুন কাজ ও পৃথ্বিরাজকে নিয়ে ভাবতে ওর শরীর সায় দল না। এখন কয়েক ঘণ্টা গভীর ঘুম দরকার। একটা সিগারেট ধরিয়ে আলোটা নেভাতে গিয়ে হঠাৎ ওর বিছানার দিকে নজর পড়ল। কে যেন শুয়ে আছে? অলক থমকে গেল। অবাক হয়ে বিছানার কাছে এসে ওপরের রাগ্‌টা সজোরে তুলে ধরল। নীচে লুসি খিলখিল করে হেসে উঠল।

—কাম অন, ডার্লিঙ তোমার সঙ্গে শুতে এসেছি আজ। হাত দুটো বাড়িয়ে বলল লুসি। তারপর অলকের বাঁ হাতের ব্যাণ্ডেজের দিকে তাকিয়ে আঁতকে ওঠার ভঙ্গী করল—একি তোমার হাতে কি হয়েছে?

অলক ওর প্রশ্নকে ভ্রূক্ষেপ না করে রুক্ষদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। ব্রা ও প্যান্টি পরে লুসি ওর বিছানায় শুয়ে আছে। বুঝতে ওর বাকী রইল না, লুসি বোকা চাকরটার সুযোগ নিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছে। এর আগেও ফ্ল্যাটে ও দু-একবার এসেছে। তবে এভাবে বিছানা-দখল এই প্রথম।

—কি হল? এস, লুসি ওর ফরসা নগ্ন হাত আরো বাড়িয়ে পাতলা আচ্ছাদনে মোড়া বুক দুটোকে উঁচু করল।

স্থির চোখে ওকে আপাদমস্তক দেখে কঠিন স্বরে বলল অলক—আবার তুমি এসেছ?

—আমি আসিনি, তুমি-ই আমাকে এনেছ। তুমি ত জান অলক, তোমাকে দেখলে আমি ঠিক থাকতে পারি না। গতকালও এসেছিলাম। আর দেরী করো না, চলে এস হনি।

—তোমার জামাকাপড় কোথায়?

—আছে, কাল সকালে ঠিক পাওয়া যাবে।

—উহুঁ, ওগুলো এক্ষুনি আমার চাই।

—কেন?

—তুমি কি এ ভাবেই বাড়ী ফিরতে চাও? নাকি লক্ষ্মী মেয়েটির মত তৈরী হয়ে নেবে?

লুসি অলকের মতই নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে বাঁ হাতটা পিঠের পেছনে ঘুরিয়ে নিল। তারপর ব্রেসিয়ারের হুক খুলতে খুলতে বলল, এক্ষুনি যাব বলে ত আসি নি। সারারাত আজ থাকব তোমার সঙ্গে।

অলক এক ঝটকায় লুসির বাঁ হাতটা শক্ত মুঠোয় ধরে ফেলল।—বেশী কথা বাড়াতে আমার ভাল লাগে না, গেট আপ বেবি। হাতটা ধরে জোরে একটা টান দিল অলক। ও জানত যে লুসির জু ডার কায়দা ভাল শেখা আছে। গত বছরই ও পুলিশের নারী বাহিনীতে ঢোকার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিল। ওর গায়ে সাধারণ মেয়ের থেকে অনেক বেশী শক্তি। তাই লুসির হাতটাকে কায়দা করে ধরতে ভুল করেনি অলক।

তবুও লুসি কাহিল হল না। অলকের হাতের ওপর ভর করেই বিছানায় উঠে বসল। তারপর অদ্ভুত ভাবে হাতটাকে ছাড়িয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরল—ইউ নটি, আবার ও কথা বলছ। আমি যে তোমায় ভাল-বাসি ডার্লিঙ। তুমি এরকম কেন বলত? বলতে বলতে লুসি ওর কামাতুর ঠোঁটদুটো অলকের মুখের দিকে এগিয়ে দিল। অলক এবার ওর হাতের জখমটার জন্য লুসির ভারী দেহটা সামলাতে পারল না। ওর ঝঁকুনিতে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। লুসি ওর মুখের ওপর মাছের মত ঠোকরাতে লাগল। নীচ থেকে সজোরে চাপ দিল অলক। লুসির বিশাল দেহখানা

ওকে যেন অক্টোপাসের মত জড়িয়ে আছে। বাঁ হাতের জখমটা বাঁচিয়ে ডান হাত দিয়ে ধাক্কা মারল। তাতেও কিছু হল না। শেষ পর্যন্ত ডান হাতের চেটোয় লুসির থুতনিতে আঘাত করতেই ও কাতরে উঠল। লুসির ডান হাতটা এবার বেকায়দায় ধরে মোচড় দিল অলক।

যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল লুসি।—ওফ্ লাগছে যে আমার।

—ওয়েল—তাহলে বেরোবে কি ঘর থেকে ?

অলক আরো জোরে হাতটা ঘোরাল।

লুসির চোখ ওপরে উঠল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—ছাড়, যাচ্ছি।

হাতটা শিথিল করতেই লুসি জিঘাংসার দৃষ্টি নিয়ে তাকাল অলকের দিকে।—ইয়ু সোয়াইন, তোমার এতবড় সাহস! সাপের মত ফোঁস করে উঠল লুসি। তুমি জান, আমাকে পাওয়ার জন্য কত পুরুষ হাঁটু গেড়ে বসে আছে ? তোমাকে আজ আমি নিজে থেকে সব দিতে এসেছিলাম। ও. কে. তোমাকে পরে পস্তাতে হবে।

লুসি শরীরের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বিছানা থেকে নামল। অলক কোমরে হাত দিয়ে ওর চলে যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। বালিসের নীচ থেকে ভাঁজ করা পোশাকগুলো বার করে লুসি ওগুলো খুলতে লাগল। খুলতে খুলতে আবার ও তাকাল অলকের দিকে। অলকের গেঞ্জিপরা রোমশ বুকটা তখন ওঠানামা করছে। একঝলক সেদিকে তাকিয়ে লুসি হঠাৎ হাতের পোশাকগুলো বিছানায় ফেলে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর।

—প্লিজ অলক, আজ রাতটুকু আমায় থাকতে দাও। এখন আমি বাড়ী কি করে ফিরি বল।

অলক তৈরীই ছিল। এবার আর লুসিকে ও গায়ের সঙ্গে জড়াতে দিল না। চট করে ওর হাতদুটো ধরে ওর পিঠের পেছন দিকে ঘুরিয়ে আনল। তারপর বাঁ-হাতে ওর কাপড় চোপড়গুলো উঠিয়ে ওকে ঠেলতে ঠেলতে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। লুসি তখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। দরজা খুলে কাপড়-চোপড় গুলো বাইরে ছুঁড়ে ফেলল অলক। তারপর লুসিকে ঠেলে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

—ইউ সোয়াইন, এ কাস্ট্রেটেড মেল। তুমি কি রকম মরদের বাচ্চা বুঝতে পেরেছি। আমাকে বেইজ্জত করলে? আচ্ছা তোমাকে দেখে নেব খোকা।

বাইরে লুসির গর্জনকে ঝাপসা করে দিয়ে অলক আবার শোয়ার ঘরে ঢুকে পড়ল।

পরের দিন সকাল আটটায় এলিয়ট রোডের টেলিফোন বুথ থেকে ফোনটা করল অলক।—ডিকি, অলক বলছি। আজ হোটেল ক্যারোলিনে যাব। তোমার সঙ্গে দেখা করতে হবে?

—আপাতত দরকার নেই। ডিকির গম্ভীর স্বর ভেসে এল, কাল করলেই হবে। তুমি নিশ্চয়ই ভেবে নিয়েছ, কিভাবে এগোবে?

—হ্যাঁ, ওর মার নার্সিং হোমটা শুধু একবার ঘুরে আসতে হবে।

—দ্যাট্স্ অল?

—ইয়েস ডিকি।

রিসিভার রেখে সহজ হল অলক। যাক, আশী হাজার টাকার কাজটা তাহলে পাকাপাকি হয়ে গেল। টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়ে ভাবল ও। ঐ টাকার জন্য কাজটা ওকে নিতে হল। কয়েকদিনের জন্য অলক কলকাতা থেকে ছুটি নিতে চায়। টাকাটা পেলে কোন এক সুন্দর জায়গায় গিয়ে কাটিয়ে আসা যাবে। ওটা ফুরোলে তারপর ভাবা যাবে অন্য কাজের কথা। গত কালের ঘটনাগুলো ঘটে যাবার পরই হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অলক। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ও মাণিকতলার এশিয়ান নার্সিং হোমের দিকে পা বাড়াল।

দারুণ জমে উঠেছে। গোল্ডী ইন ব্লুজের পর গোল্ডী ইন এ্যারেবিয়ান নাইটস। দি ওনলি কর্ণারের ডায়াসে যেন একটা ঝড় বইছে। একদিকে যেমন হোটেল ক্যারোলিনের মনমাতানো অর্কেস্ট্রা আর একদিকে তেমনি দেহমাতানো নাচ। দর্শকের মধ্যে নিশ্বাস ফেলারও সময় নেই। নিজেদের দেহ শক্ত করে প্রত্যেকেই সেই লোভনীয় দেহের আন্দোলন

দখতে ব্যস্ত।

অলক ডায়াস থেকে একটু দূরেই বসেছিল। অন্ধকার কোণ থেকে সও এক দৃষ্টিতে গোল্ডীর দিকে তাকিয়ে ছিল। তবে ওর দৃষ্টি অন্যদের মত মাহাবিষ্ট ছিল না। ডিকির প্ল্যান মাথায় নিয়ে ও লাস্যময়ী মেয়েটিকে নিরীক্ষণ করে চলল।

গোল্ডীর বয়েস কুড়ি থেকে তেইশের ভেতর। মেয়েটি দীর্ঘাঙ্গী। দহের গঠন অপূর্ব। ওর দীর্ঘ পেলব পা, ভরাট নিতম্ব, কুঁজোর গলার মত রু কোমর, অলককে সিনেমায় দেখা বিশ্ব সুন্দরীদের কথা মনে পড়িয়ে দিল। গোল্ডীর প্রসাধনহীন তলপেটের ফিকে রক্তের রঙ সারা দেহে ড়ান। শক্ত কাঁচুলীতে বাঁধা সুডৌল ছুটো বুক। গোল্ডীর দীর্ঘ মসৃণ াত ওর পায়ের মতই সুন্দর!

সবশেষে গোল্ডীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল অলক। আর তখনই কে থমকে যেতে হল। মুখটা সুন্দর, খুবই সুন্দর, তবে এ সৌন্দর্য কোন ্যাবারে ড্যান্সারের মুখে মানায় না। কারণ তাতে কোন চোখ ধাঁধানো গ্রতা নেই। তার বদলে এক স্নিগ্ধ কমনীয়তা। অলক ওর আধখানা মের মত কপালের দিকে তাকাল, যেটা লালচে কালো চুলের গোছ কে ঘন ভ্রু অবধি ছড়িয়ে আছে। তার নীচে জীবন্ত টানা ছুটো চোখ ীক্ষ্ণ নাক, পাতলা ঠোঁটের ঢেউ খেলান জায়গাটুকু ছোট। গোলাকার ল ছুটো চিবুকের কাছে এসে বেঁকে গেছে। অলক একনজরে সারা খটায় আর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। পেশাগত ভাবের অভাব, তবে পের মত রূপ বটে। ও ভাবল, ডিকির পছন্দের তুলনা হয় না। দীপক রায়েকার মত কোটিপতির প্রেয়সী বলে একেই চালানো যেতে পারে। ই মুখের দিকে তাকালে দীপক আট দিন কেন আট ঘণ্টা সময় নেবে না সন্দেহ।

হাত ঘড়িতে তখন এগারটা বেজে চল্লিশ। গোল্ডীর নৃত্যের গতিবেগ াৎ তুঙ্গে উঠল। মাতঙ্গিনী ঝড়ের মত সবকিছু এলোপাথাড়ি করে উড়ে চলল ডায়াসের ওপর। ওর অবিন্যস্ত স্বল্প পোশাকের দিকে কিয়ে দর্শকদের পলক ফেলারও সময় নেই। নাচের ভাবভঙ্গী দেখে

গোল্ডার মেকাপ রুমে ওর বেয়ারা এসে খবর দিল। —মেমসাব। এক সাব আপসে মুলাকাত করনে কো মাঙতা হ্যায়।

গোল্ডী তখন সবে নাচের পোশাক ছেড়ে শাড়ি পরেছে। বারোটা বাজতে পাঁচ। এখন বাড়ী ফেরার তাড়া ওর।

—মুলাকাত! আমার সঙ্গে? গোল্ডী আঁচলটা কাঁধের ওপর ফেলে ঘুরে দাঁড়াল। তুই কি জানিস না বাহাদুর, আমি কারুর সঙ্গে দেখা করি না? যা, যা, দেখে আয়, হোটেলের গাড়িটা বেরিয়েছে কিনা। আমার যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।

—লেকিন মেমসাব, আপকা পহচানকা আদমী মালুম হোতা হ্যায়।

—ভাগ তো তুই, লোকটাকেও ভাগিয়ে দে! গোল্ডী বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠল। আমার জানাশোনা কোন লোক এখানে আসবে না।

—এশিয়ান নার্সিং হোম সে আয়া হ্যায় মেমসাব।

এবার গোল্ডী চমকে উঠল। নার্সিং হোমের নামটা শুনে কপাল কুঁচকে তাকাল। এশিয়া নার্সিং হোম, যেখানে ওর মা থাকে? তার কোন খবর নিয়ে এসেছে কি লোকটা? গোল্ডী সন্ত্রস্ত হয়ে বেয়ারার কাছে এল। —এশিয়া নার্সিং হোম, উনি বললেন?

—জী হাঁ।

—কোথায় তিনি?

—লাউঞ্জ মে হ্যায়।

—যা, ডেকে আন—।

বেয়ারা ছুটে চলে গেল। গোল্ডীও হন্তদন্ত হয়ে মেক-আপ রুমের পাশে ওর বিশ্রাম নেওয়ার ঘরটায় ঢুকল। সোফায় বসে আগন্তুকের জন্য চিন্তিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই সে এল। গোল্ডী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। সে

পোশাক পরা একজন অপরিচিত সুদর্শন যুবক। দেখে চোখমুখে ওর ভাঁজ পড়লো। এ তো নার্সিং হোমের কেউ বলে মনে হচ্ছে না। তাহলে—?

—নমস্কার। অলক ঝুঁকে হাত জোড় করে বলল।—কিছু মনে করবেন না। অনেকটা অযাচিত ভাবেই এলাম।

কিন্তু-কিন্তু করে গোল্ডীও প্রত্যুত্তরে হাত ওঠাল।—আপনি?

—চিনতে পারছেন না, তাইত? আমি কিন্তু আপনাকে ভাল করেই চিনি। অলক দরজার কাছ থেকে একটু এগিয়ে এল। এশিয়া নার্সিং হোমের কাছে থাকি আমি। আপনি ত সেখানে দু বেলাই যান?

ও, লোকটা তাহলে ওকে চেনে, এই যা। তাহলে অন্য ব্যাপার। গোল্ডী উঠে দাঁড়াল।—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি···এখানে—?

—ক্যাবারে দেখতে এসেছিলাম। ডায়াসে আপনাকে দেখব আশা করিনি। আপনি যে একজন ক্যাবারে ড্যান্সার জানতাম না। যাই হোক আমি যে জন্য দেখা করতে এসেছি—।

—বলুন।

—আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল। কথাটা আপনাকে নিয়েই। আপত্তি না থাকলে আমার সঙ্গে একটা এ্যাপয়ন্টমেন্ট করতে পারবেন?

অলকের হঠাৎ এই প্রস্তাবে গোল্ডী থতমত খেয়ে যায়।

—আমাকে নিয়ে কথা···মাপ করবেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—যদি না আপনি একটু সময় দেন আমিও বোঝাতে পারব না।

গোল্ডী ভাবতে ভাবতে দেয়ালে হাত রেখে দাঁড়াল—বেশ, এখানেই বলুন না।

—এখানে? চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে অলক বলল, কিন্তু জায়গাটা যে আমার পছন্দ হচ্ছে না। আসলে, ক্যাবারের আমি ভক্ত নই ত, বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে এসেছিলাম। আপনি যদি অন্য কোথাও দেখা করতেন তাহলেই ভাল হত।

গোল্ডী কপাল কুঁচকে মুখ তুলে চাইল। ও ঠিক বুঝতে পারল না আগন্তুক কি বলতে চায়। নার্সিং হোমের কাছে থাকে যখন, হয়তো ওকে চেনে। কিন্তু তাহলেও ওকে নিয়ে তার বলার কি থাকতে পারে?

গোল্ডী আপাদমস্তক দেখল ওকে। ইচ্ছে করলে অবশ্য এক্ষুনি ওকে তাড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু অলকের দীর্ঘ সম্ভ্রান্ত চেহারা দেখে তা করতে ওর মন সায় দিল না। ওর পুরুষোচিত গাম্ভীর্য ও মার্জিত স্বর শুনে গোল্ডীর একটু কৌতুহল। তাই কিছুক্ষণ পর ও বলল, বুঝলাম কিন্তু আমি যে বাইরের কারুর সঙ্গে এ্যাপয়ন্টমেন্ট করি না।

—হতে পারে। কিন্তু এ্যাপয়ন্টমেন্ট বলতে আপনি যা বুঝছেন, আমার উদ্দেশ্য তা নয়। আপনাকে আমি চিনি, আপনার মাকেও আমি জানি। যিনি প্রায় বছরখানেক প্যারালাইজড হয়ে নার্সিং হোমে আছেন। আমার কথাগুলো সত্যি কথা বলতে, আপনাদের দুজনকে নিয়েই ছিল। তবে আপনার যদি অসুবিধে থাকে তাহলে থাক্—। অলক চলে যাবার ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়াল।

—দাঁড়ান, গোল্ডী এবার একটু অবাক হয়ে এগিয়ে এল। কি বললেন, আমার মাকে আপনি চেনেন?

—যেমন আপনাকে চিনি।

গোল্ডী বিস্ময়ের দৃষ্টিতে অলকের চোখের দিকে তাকাল। একজোড়া গভীর চোখ সহজভাবে গোল্ডীর দিকে তাকিয়ে আছে। এমন চোখ যাতে বিশ্বাস করা যায়। একটু পরে গোল্ডী নিজেকে বলতে শুনল, কোথায় আপনি দেখা করতে চান?

—এসব হোটেল ছাড়া যেখানে আপনার ইচ্ছে।

—কাল সকাল নটার মধ্যে পিপিঙে আসতে পারবেন?

—তার চেয়ে, রাসবিহারীর অশোকাতে আসুন না, অসুবিধে হবে?

—ঠিক আছে, তাই হবে। কিন্তু সকাল নটা।

—হ্যাঁ, নটা। আচ্ছা, চলি, নমস্কার।

পরের দিন নটার একটু আগেই অলক রাসবিহারীর 'অশোকা'-তে এসে উপস্থিত হল। রেস্টুরেন্টটা তখন প্রায় ফাঁকাই। এত সকালে এসব রেস্টুরেন্টে কেউ বড় আসে না। অলক সেটা জানত। সেজন্যই গোল্ডীকে এখানে আসতে বলেছে। বেয়ারাকে কফির অর্ডার দিয়ে কোণের টেবিল

দেখে ও বসে পড়ল।

অলক আজ গাঢ় ছাই রঙের টেরিসিল্কের স্যুট পড়েছিল। তার সঙ্গে সাদা ইজিপ্‌সিয়ান কটনের শার্ট। ওর গলায় সাদা-কালো ডোরা কাটা টাইখানা স্যুটের সঙ্গে মানিয়েছিল বেশ। বাইরে সকালের রোদ্দুর তখন ফুটপাথ ছাড়িয়ে রেস্টুরেন্টের দেওয়াল অবধি এসে গেছে। বিশাল কাঁচগুলোর মধ্য দিয়ে ঝলমলে আলো এসে পড়েছে ভেতরে। অলকের কোটের আস্তিন থেকে বেরোন ইম্‌পোর্টেড মেটালিক কাফলিঙ দুটো সেই আলোয় চিকচিক করছিল। পায়ের চকচকে জুতোও সমান উজ্জ্বল। শীতের সকালে অলকের এই রুচিসম্পন্ন পোশাক ওর চেহারায় আভিজাত্য এনে দিয়েছে। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে ও গোল্ডীর অপেক্ষায় সিগারেটে মৃদু টান দিতে থাকল। তবে বেশিক্ষণ ওকে বসতে হল না।

নটা বেজে মাত্র একমিনিট হয়েছে তখন, গোল্ডীকে রেস্টুরেন্টের দরজায় দেখা গেল। অলক অবাক হয়ে দেখল কাল রাতের প্রায় অনাবৃত গোল্ডীর দেহ জড়িয়ে আজ সবুজ প্রিন্টেড শাড়ি। মুখে প্রসাধনের ছোঁয়া, নেই বললেই হয়। মাথার চুলগুলো সাধারণ মেয়েদের মত সারা পিঠ জুড়ে ছড়ান। পায়ে সরু লাল স্ট্র্যাপের চটি আর হাতে ছোট একটা কয়েন ব্যাগ। ঘরোয়া ভাব নিয়ে গোল্ডী তখন কাছে এসে পড়েছে।

—বাঃ একেবারে কাঁটায় কাঁটায়। ওর নতুন আবির্ভাবকে আত্মস্থ করে মৃদু হাসল অলক। —বসুন।

সামনের চেয়ারে নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে গোল্ডী বসল। সাধারণ পোশাক ও সহজ হাবভাবের এই ভদ্রমহিলাকে গোল্ডী বলে ভাবতে অলকের কিছুক্ষণ সময় লাগল। তবে বিস্ময়ের ঘোরটা ও চটকরে কাটিয়ে নিল। তারপর সহজ গলায় এমন ভাবে বলল যেন গোল্ডী ওর কতদিনের চেনা।—আপনি ত রোজই একবার সকালে নার্সিং হোমে যান, আজও যাবেন নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ, এখান থেকেই যাব। গোল্ডী কয়েন্ ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে বলল, আপনার কথাটা সারতে কি বেশিক্ষণ লাগবে?

—না, মোলায়েম সুরে বলেই অলক মনে মনে ভাবল, সেটা ত তোমার ওপর নির্ভর করছে সুন্দরী, ডিকির মরণ ফাঁদে পা দিতে কতক্ষণ তুমি নেবে

কে জানে ? তবে কিছু সময় লাগবে বই কি। তারপর গোল্ডীর দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল—কি খাবেন বলুন ?

—আপনি খান, আমি কফি নিচ্ছি।

—তা হয় না, রেস্টুরেণ্টে বসে কথা বলব, কিছু না খেলে খারাপ দেখাবে। তা ছাড়া, অশোকাতে এর আগে খাননি বুঝি, এখানকার নুডলস খুব বিখ্যাত, খেয়েই দেখুন না। নিজের কথা শুনে অলকের নিজেরই অবাক লাগল। কারণ সত্যি কথা বলতে কি নুডলস ও এখানে একবারই খেয়েছিল। আর সেটাই ও তখন ভেবে রেখেছিল, অশোকাতে শেষবারের মত নুডলস খাওয়া। কিন্তু গোল্ডীকে হাঁ কি না বলার সুযোগ দিল না। তক্ষুনি বেয়ারাকে ডেকে দু প্লেট নুডলস অর্ডার দিয়ে ফেলল। অবশ্য অর্ডার দেবার আগে আর একবার ও আড়চোখে টেবিলের মেনু কার্ডটা দেখে নিল। একমাত্র নুডলসের পাশে ব্র্যাকেটে লেখা ছিল, 'নুডলস অর্ডার দিলে কিছুক্ষণ বসিতে হইবে।'

কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে অলক সামনের মুখটার দিকে তাকাল। মেয়েটা সেজেগুজে আসে নি সেটা ভাল কথা। ওর সাথে একসঙ্গে কারো নজরে পড়ে গেলে বিপদ আছে। কিন্তু তবু ভাবল অলক, এত সাদামাটা কেন মেয়েটা ? ডিকি অবশ্য বলেছিল ও নাকি ক্যাবারে লাইন বেখাপ্পা। তাহলেও জীবিকার একটা ছাপ ওর চোখ মুখে ও আশা করেছিল। যাই হোক গোল্ডীর মুখের নিরীহ-সরল ভাব দেখে অলক বুঝল, কাজের কথায় এগিয়ে যেতে বিশেষ অসুবিধে হবে না।

কিন্তু ওর কিছু বলার আগেই গোল্ডী বলে উঠল—আপনার নামটা কিন্তু এখনো জানতে পারলাম না।

—তাপস মুখার্জী। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল অলক।

—মাণিকতলায় কোথায় থাকেন ?

—রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট। তবে এখানে আমি খুব কম থাকি। বোম্বে হচ্ছে আমার কাজের জায়গা। ওখানে একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ করি। গোল্ডীর প্রশ্ন দুটোর উত্তর দিয়ে অলক ওর মুখের ভাবটা একবার নিরীক্ষণ করে নিল। তারপর আরও সহজ ভাবে জিজ্ঞেস করল—আপনার মা

এখন কেমন আছেন ?

গোল্ডী অবাক হয়ে তাকাল। ওর প্রশ্নের ঢঙ শুনে ভাবল, পরিচয়টা ওদের মধ্যে এক্ষুনি হল' না অনেক দিনের ? তবু ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে জবাব দিল—খুব একটা ভাল নয়, আগের মতই ভুগছেন।...কিন্তু মিঃ মুখার্জী, আপনি আমাদের এতটা চিনলেন কি করে ?

—আপনিই চিনিয়েছেন। সুন্দরভাবে হাসল অলক। সিগারেটের অর্ধেকাংশটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে কোলের ওপর হাত গুটিয়ে বলল, কতগুলো চেহারা আছে জানেন, যেগুলো মনে রাখবার মত। পথে ঘাটে সে চেহারাগুলো হাজার জনের মধ্যেও সহজে চোখে পড়ে। এ রকম একটা চেহারা আপনার আছে। গোল্ডীর মুখটা লজ্জায় লাল হতে দেখে অলক অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিল—সেজন্য বছর খানেক আগে আমি যখন কলকাতায় ছিলাম তখন আপনাকে আমার পাড়া দিয়ে দুবেলা আসতে যেতে দেখে চিনি রেখেছিলাম। তারপর একদিন নার্সিং হোমে আপনার মাকেও দেখেছি।

গোল্ডীর নীরব মুখে প্রশ্ন ফুটে ওঠে।

সে প্রশ্নেরই জবাব দিল এবার অলক। —ঐ সময় আমার এক আত্মীয় এশিয়া নার্সিং হোমে ভরতি ছিলেন। তাঁকে মাঝে মাঝে দেখতে যেতাম। তখনি আপনাকে আপনার মার পাশে বসে থাকতে দেখেছি। অতএব বুঝতেই পারছেন, আপনি আগে থেকেই আমার পরিচিত।

গোল্ডীর দৃষ্টি নীচের দিকে নামল। ওর মুখের ভাব দেখেই বুঝল অলক, এই ছোট মিথ্যেটা ভালভাবেই উতরে গেছে। যদিও অলকের কথা বলবার কায়দাটা বেশ তুখোড়, তবু এত তাড়াতাড়ি গোল্ডীর বিশ্বাস হাঁসিল করতে গোল্ডীর সরলতাও যে সাহায্য করেছে সেটা ও বুঝতে পেরেছিল। কারণ মেয়েটি এরপর আর কোন প্রশ্নই করল না।

অলক এবার আসল কথার দিকে এগিয়ে গেল। হাতদুটো টেবিলের ওপর উঠিয়ে ধীরে ধীরে বলল—তবে হ্যাঁ, আপনি যে একজন ক্যাবারে ড্যান্সার এটা আমি জানতাম না। আচ্ছা, আপনি কি বছরখানেক আগেও এ লাইনে ছিলেন ?

—হ্যাঁ, ভাবতে ভাবতে বলল গোল্ডী, কিন্তু কেন বলুন ত ?

—না, তার কারণ তখন আমি ভাবতে পারি নি, অবশ্য আজও পারছি না। কিছু যদি মনে না করেন, বলবেন এ লাইনে আপনি এলেন কেন ?

—আপনি কি এজন্যই আমাকে ডেকেছেন ? গোল্ডীর স্বরে এবার বিরক্তির ঝাঁজ।

—না, তবে এর উত্তর পেলে সেটা বলতে আমার সুবিধে হত।

—আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দেব, আপনি আশা করেন কি করে ?

বুঝল অলক, আসল জায়গাতেই ঘা দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে মেয়েটার দুঃখ বেশ টনটনে। চট্ করে জবাব দিল।—আপনাকে চিনি বলে। তবে আমি জানি আপনি আমাকে চেনেন না, তাই উত্তরটা দিতে সঙ্কোচ হচ্ছে আপনার। তবে মিস গোল্ডী, উত্তর না জেনেও আমি বলব এ লাইনে যে জন্যেই আপনি আসুন না কেন, এসে দারুণ ভুল করেছেন। সবার কি সব জায়গা সাজে ?

অলকের আর্দ্র কণ্ঠ গোল্ডীর মুখের কঠিন ভাবটা মিলিয়ে দিল। অলকের গভীর চোখে চোখ রেখে সে বলল—কিন্তু সাজাতে হয় মিঃ মুখার্জী। মনে রাখবেন, অন্য উপায় থাকলে খুব কম মেয়েই এ পথে আসে।

—বুঝেছি, আপনার মায়ের চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা দরকার, তাই তো ? বেশ, আমি যাদি একটা অন্য উপায় বাতলে দি আপনাকে ? তাহলে নিশ্চয় এ পথ ছাড়বেন আপনি ?

—কিন্তু আমাকে এ পথ ছাড়িয়ে আপনার লাভ ?

প্রশ্নটা শুনে নিশ্চিন্ত হল অলক। যাক্, মেয়েটা একেবারে ডলপুতুল নয়; মগজে কিছু আছে। মুখে হালকা হাসি এনে বলল—আমার লাভ ? নিশ্চয়, আমার লাভ আছে বই কি। তা নাহলে এই সাতসকালে আপনার সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করি ? তবু আমি বলব, মিস গোল্ডী, আমার লাভটা এখানে বড় নয়, আসলে আমি আপনাকে এ পথ ছাড়াতে চাই। তাতে যদি জিজ্ঞেস করেন কেন, তার জবাব আমি দিতে পারব না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, একটি পরিচিত মুখকে হোটেলের ডায়াসে দেখে কাল আমার বেশ কষ্ট হয়েছিল।

গোল্ডী বোধহয় একটু চমকে উঠল। অলকের চোখ থেকে দৃষ্টি নামিয়ে নিল। কিছু বলল না।

অলক তখন বলত শুরু করেছে—বোম্বেতে আমি যে কোম্পানীতে কাজ করি তার মালিক আমার বন্ধুস্থানীয় লোক। তার একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়েছি আমি। বলে একটু ইতস্তত করল অলক। তারপর গাঢ় দৃষ্টিতে গোল্ডীর দিকে তাকিয়ে বলল—সত্যি কথা বলতে সেই কাজের জন্য আমরা একজন যথার্থ সুন্দরী মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কাজের ভারটা দিতে চাই তাকে। ক্যাবারেতে দেখার আগে অবশ্য আপনার কথা আমার মাথায় ছিল না। এখন যদি আপনি রাজী থাকেন—।

গোল্ডী উৎসুক বোধ করল। কনুইটা টেবিলের ওপর রেখে একটু ঝুঁকে বলল—বিকল্প কিছু পেলে ক্যাবারে লাইন ছাড়ার জন্যে আমি উদগ্রীব হয়েই আছি। কিন্তু আপনি যে বললেন কাজটা কয়েকদিনের জন্য।

—তা ঠিক। তবে এই কদিনের জন্য আপনি যা পাবেন তা আমার মনে হয় আপনার ক্যাবারে জীবনের এক বছরের রোজগারের সমান।

—এক বছরের রোজগার! কত বলুন ত?

—বিশ হাজার। দশ হাজার অ্যাডভান্স, দশহাজার কাজের পর।

শুনে গোল্ডী থতমত খেয়ে গেল—কাজটা কি?

—একটা অভিনয় করতে হবে।

—ও, থিয়েটার ফিল্মের কথা বলছেন?

—না, সত্যিকারের জীবনের অভিনয়। তবে খুবই সৎ উদ্দেশ্যে। গোল্ডী কিছু না বোঝার দৃষ্টিতে তাকাল। আসল কথায় আসতে আর বেশি সময় নিল না অলক—আমার যে বন্ধুটির কথা আপনাকে বলছিলাম, কয়েকদিন হল সে তার ভাইকে নিয়ে বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছে। ছেলেটি সম্প্রতি ত্বার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। কারণটা সঠিক না জানা গেলেও আমরা বুঝতে পেরেছি যে ওর জীবন যন্ত্রণাই এর মূলে। কারণ ছেলেটি বরাবরই খুব ভাবুক। স্বভাবে ও হাবভাবে অনেকটা দার্শনিকের মতো। জীবনকে ও উপভোগ করতে জানে না। জানে না বাঁচার আনন্দ কোথায়। আমাদের কাজ এই ছেলেটিকে নিয়ে। আপনি পারবেন ওর জীবনের

স্বার্থে আপনার কয়েকটা দিন খরচ করতে? এই ধরুন, কিছুদিনের জন্য ওর খুব কাছের মানুষ সেজে ওকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা, এই আর কি। এর বেশি নয়। মোটমাট ছেলেটিকে ওর আত্মঘাতী মনোবৃত্তি থেকে সরিয়ে আনতে হবে। নাটকীয় ভঙ্গীতে কথাগুলো শেষ করে অলক গোল্ডীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

গোল্ডী তখন টেবিল থেকে হাত সরিয়ে ওর শরীরের কঠিন ভাবটা শিথিল করেছে।—ও, বুঝলাম। তারপর মাথা নেড়ে ও বলল, না, মিঃ মুখার্জী। আপনি যদি এজন্যই আমার সঙ্গে দেখা করে থাকেন, তাহলে আমি দুঃখিত। এ ধরণের কাজ আমার দ্বারা হবে না।

গোল্ডীর সরাসরি প্রত্যাখানে তখনি কোন ভাব প্রকাশ করল না অলক। সিগারেটের একটা দীর্ঘ টান নিয়ে একটু পরে ওর চোখে চোখ রেখে বলল—হুঁ কাজটা অদ্ভুত ধরনের। সবার দ্বারা এ কাজ হবে না, জানি। কিন্তু আমি আশা করেছিলাম আপনি রাজী হবেন। কারণ, কয়েকশ লোককে রাতের পর রাত অনিচ্ছা সত্বেও আপনাকে দেহ দেখিয়ে আনন্দ বিতরণ করতে হয়, সে জায়গায় ভেবেছিলাম, একটিমাত্র লোককে কয়েকদিনের জন্য মানসিক আনন্দ দিতে পেছপা হবেন না। অলকের স্বর আরো গাঢ় হল—আমার অনুরোধ, মিস গোল্ডী, এই প্রস্তাব পুরো নাকচ করার আগে আর একবার ভেবে দেখবেন, কারণ মানবিক দিক দিয়ে এ কাজের মূল্য হয়ত কেউ দিতে পারবে না, কিন্তু পারিশ্রমিক হিসেবে আপনি যে টাকাটা পাবেন সেটা আমার মনে হয় আপনার এখনকার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট।

অলকের মোহ ছড়ান চোখে চোখ রাখতে পারল না গোল্ডী। দৃষ্টি নামিয়ে বলল—টাকার প্রশ্ন নয়, মিঃ মুখার্জি, প্রশ্নটা হল কাজের ধরণ নিয়ে। হোটেলের নাচে বাধ্য হয়ে নামলেও এটা একটা পেশা। সমাজের দৃষ্টিতে তার স্থান যেখানেই থাকুক না কেন। কিন্তু জীবন-সঙ্গিনীর অভিনয় করে টাকা রোজগার আমি ভাবতে পারছি না। আমাকে মাপ করবেন।

—বুঝলাম, টাকার কথাটা উঠল বলে আপনি কাজটাকে এ ভাবে দেখছেন। কিন্তু আপনি আমাকে ভুল ভাবলেন। পেশাগত দিক দিয়ে

এ কাজ আপনাকে আমি করতে বলি নি। টাকার কথা ওঠার দুটো মাত্রই কারণ। একটা হল, আমার যে বন্ধু এই অনুরোধ নিয়ে আমার কাছে এসেছে সে তার ভাই-এর জীবনের জন্য প্রচুর টাকা খরচ করতে প্রস্তুত আর দ্বিতীয় কারণ, যার কাছে এ প্রস্তাব নিয়ে আমি এসেছি তারও টাকার খুব প্রয়োজন। এখন ধরুন, আপনার মত সুন্দরী যদি আমার কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া থাকত তাহলে এ প্রস্তাব নিয়ে নিশ্চয়ই তার কাছে যেতাম। কিন্তু সেখানে টাকার কোন প্রশ্ন উঠত না। অতএব বুঝতেই পারছেন, টাকাটা এখানে বড় নয়, বড় হচ্ছে একটা ছেলের জীবন।

নিখুঁত বক্তৃতাটি শেষ করে অলক আড়চোখে তাকিয়ে দেখল গোল্ডীর মুখে ভাবনার ছায়া পড়েছে। অর্থাৎ পাখী পোষ মানতে আর দেরী নেই।

ওর আন্দাজ সঠিক করতেই গোল্ডী বলে উঠল—কিন্তু এ ধরণের অভিনয় জটিল হয়, মিঃ মুখার্জী। সত্যি কথা বলতে কি, অনেক ঝামেলাও আনতে পারে।

অলক একটা বুকভরা নিশ্বাস নিল।—আপনার এ আশঙ্কা যথার্থ মনে করতাম যদি অভিনয়টা আপনি লুকিয়ে-চুরিয়ে করতেন। সঙ্গে সঙ্গে ও বলল—কিন্তু এ ক্ষেত্রে যার জন্য আপনি অভিনয় করছেন একমাত্র সে ছাড়া আমরা সবাই জানছি যে এটা অভিনয়। এখানে ঝামেলার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

—ঠিক আছে, অভিনয় না হয় করলাম কিন্তু যদি কৃতকার্য না হতে পারি, তাহলে ?

—করার কিছু নেই। আপনার চেষ্টাটা সেখানে যথেষ্ট।

—কতদিন এ চেষ্টার মেয়াদ ?

—মাত্র আট কি ন দিন। আমার বিশ্বাস এর মধ্যেই আপনি ওকে স্বাভাবিক করে তুলতে পারবেন।

গোল্ডী টেবিলে রাখা কয়েন ব্যগটা শক্ত মুঠোয় ধরল—আচ্ছা ধরুন, সে যদি আমার অভিনয়কে শেষ পর্যন্ত সত্যি বলে মনে করে, তখন ?

—সেখানেই আপনার সাফল্য। আর তার পরেই আপনার অভিনয় শেষ। অর্থাৎ প্রদীপে আগুন জ্বালাতে যাবেন আপনি, সেটা জ্বলে গেলেই

আপনার ছুটি।

—এজন্য কি আমাকে বোম্বে যেতে হবে ?

—না, বোম্বে নয়, তবে যদি কোথাও যেতে হয় সে সব পরের কথা। আপনি রাজী কিনা আগে বলুন ? তারপর সুবিধেমত সব ঠিক করা যাবে। অলক রানীক্ষেতের কথা চেপে গেল। গোল্ডী রাজী হলেও কথাটা ওকে শেষ মুহূর্তে বলা হবে। এ রকমই নির্দেশ ছিল ডিকির।

গোল্ডী তখন বেশ গম্ভীর হয়ে একদিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। অসুস্থ মার কথাই ভাবছিল ও। কারণ কথাটা সত্যি, বিধবা মার চিকিৎসার জন্যই ওর এই ক্যাবারে লাইনে আসা। আগে ও একটা গান বাজনার স্কুলে নাচ শেখাত। সেখানকার সামান্য মাইনেতে ওদের নিজেদের সংসার খরচ কুলোতো না, তারপর মার চিকিৎসার খরচ সামলানো ত দূরের কথা। তাই বাধ্য হয়ে ক্যাবারে ডান্স শিখতে হল ওকে। যদিও এদিকে নবাগতা বলে ওর রোজগার এখনো তেমন কিছু বেশী নয়। তবু এই রোজগারের জন্য ও মাকে একটা ছোটখাটো নার্সিং হোমে রাখতে পেরেছে। সেটা যেমন একদিকে বিরাট সান্ত্বনা অন্যদিকে এই পেশাটা ওর কাছে একটা অসহ্য দংশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই বিশ হাজার টাকাটা নিয়ে ও কিছুক্ষণ ভাবল। তার সঙ্গে অলকের কথাও। তারপর ও চিন্তিত ভঙ্গীতে মাথা ওঠাল।

—আমাকে একটু ভাবতে দিন। আস্তে আস্তে বলল গোল্ডা, আমার মত কি এক্ষুনি জানানো দরকার ?

—নিশ্চয় নয়। আপনি ভেবে বলুন। কাল রাতের মধ্যে জানালেই হবে। তবে একটা কথা মিস গোল্ডী, এ নিয়ে যা ভাববেন, নিজেই যেন ভাবেন। অন্য কারোর সঙ্গে এ বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও আলোচনা করবেন না। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আমরা নেহাত অভিনয়ের পর্যায়ে রাখতে চাই। আর সে জন্য সবকিছু আমাদের মধ্যেই রাখতে হবে, সেটা খেয়াল রাখবেন। বলেই অলক উঠে দাঁড়াল।

সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে গোল্ডীও উঠল।

টেবিলে তখন ওদের খাবার আছোঁয়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বিলের

টাকাটা তার পাশে রেখে অলক গোল্ডীর সঙ্গে বাইরের দিকে পা বাড়াল।

রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে ওরা আলাদা হয়ে গেল। গোল্ডী ভাবতে ভাবতে ভাবতে চলে গেল মানিকতলার বাস ধরতে। অলক দূর থেকে তাকাল ওর দিকে। গোল্ডীর চলার ভঙ্গীটাও খুব সাধারণ মেয়ের মত। নিরীহ সরল ভাব ওর সব কিছুতেই বিদ্যমান। অলক ভাবল মনে মনে, নির্ঝঞ্ঝাট খুন হবার পক্ষে খুব উপযুক্ত মেয়ে। তবে দীপক স্নুরায়েকাকে কামনার জালে জড়াতে পারবে কিনা সেটাই এখন প্রশ্ন।

'অশোকা'তে গোল্ডীর সঙ্গে অলকের কথাবার্তার চারদিন পরের কথা।

মাঝ-রাত হতে তখন আর বেশি দেরী নেই। ব্লু-ক্যাসলের তিন তলার সেই ঘরে চারজন ছোট টেবিলকে ঘিরে বসে আছে। ডিকি, সোহনলাল অলক ও পৃথ্বিরাজ। চার চারটে লোক থাকা সত্ত্বেও ঘরটা তখন নিস্তব্ধ। টেবিলের ওপর একটা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। তার চারপাশে অন্ধকার।

টেবল-ল্যাম্পের নীচে কতকগুলো কাগজপত্র, তার পাশে অ্যাশট্রে ভর্তি পাইপের পোড়া তামাক ও সিগারেটের টুকরোর গাদা।

ও পাশের জানালা দুটো খোলা। ঘরের একমাত্র দরজাটা বন্ধ। জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকার থেকে মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া এসে দামী তামাকের গন্ধটা চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

চারজনের মধ্যে ডিকি ও সোহনলাল চিন্তামগ্ন। অলক সিগারেট হাতে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। পৃথ্বিরাজ টেবল-ল্যাম্পের আড়ালে জুল জুল চোখে বসে আছে।

ডিকি হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকাল। ওর দেখাদেখি অলকও দেখল। বারটা বাজতে দশ। সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে তখনি ও উঠে দাঁড়াল। তারপর এগিয়ে গেল ঘরের কোণে রাখা ফোনের দিকে।

একটা নম্বর ডায়াল করল অলক। রিসিভার তুলে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলল। ওর চাপা স্বর স্পষ্ট করে ওরা কেউ-ই শুনতে পেল না। সোহনলাল ও পৃথ্বিরাজ সেই আবছা অন্ধকারের দিকে উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল। ডিকি শুধু চোখ বুজে ঘনঘন পাইপে টান দিতে থাকল।

রিসিভার রেখে ফিরে এল অলক। এবার ডিকও তাকাল।

—মেয়েটা রাজী। অলকের গম্ভীর কণ্ঠ এতক্ষণের নীরবতাকে ভাঙ্গল, ওদের আরো কাছে এগিয়ে এসে বলল—কিন্তু সেই একটাই সর্ত—আমাকে থাকতে হবে ওর সঙ্গে।

—তার মানে? সোহনলালের কপাল কুঁচকে উঠল।

—তার মানে মেয়েটা একা আলাদাভাবে কিছু করতে রাজী নয়। অলক প্যাকেট থেকে নতুন সিগারেট বার করে কোচে বসল।—কলকাতা থেকে রাণীক্ষেত অবধি সব সময় আমাকে ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে।

—কিন্তু সেটা কি সম্ভব? ডিকর দিকে তাকিয়ে সোহনলালের স্বরে বিস্ময় ও আশঙ্কার সুর ফুটে উঠল। যে মেয়েটা খুন হবে তার সঙ্গে আমাদের একজন থাকবে, তা কি করে হয়?

—তুমি ঠিকই বলেছ, ডিকি ভরাট গলায় সমর্থন করল ওকে। আমাদের ভবিষ্যতের নিরাপত্তার দিকে তাকিয়ে সেটা বলতে গেলে অসম্ভব। আমরা জেনে শুনে পুলিসের কাছে নিশ্চয় এমন কোন সূত্র দেব না যাতে আমাদের সাথে গোষ্ঠীর যোগাযোগটা ধরা পড়ে যায়। যা দেখছি, মেয়েটা খুব ভীতু ও বড় সাদাসিধে। অলককে তিন-তিনবার গিয়ে ওকে বোঝাতে হল, তবুও ঠিকমত পথে এল না। যাক গে, কথা হল মেয়েটাকে আমাদের চাই। ডিকি মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে জোর দিয়ে কথাটা বলল—তুমি ত জান সোহনলাল যে দীপক সুরায়েকা নিষিদ্ধ জগতের মেয়ে নিয়ে বহু নাড়াচাড়া করেছে। কে লাইনের আর কে বে-লাইনের ওর পক্ষে বার করা খুব সহজ। সেখানে আমার মনে হয়, একমাত্র গোষ্ঠী-ই ওকে ভাঁওতা দিতে পারে। ওকে যদি আমরা সেভাবে ওর সামনে উপস্থিত করতে পারি, তাহলে দীপক কল্পনাও করতে পারবে না যে গোষ্ঠী একজন ক্যাবারে ড্যান্সার। তা ছাড়াও মেয়েটার মধ্যে এমন অনেক কিছুই আছে যা দিয়ে দীপককে ঘায়েল করতে বেশী সময় লাগবে না—অতএব গোষ্ঠীর এই আবদার কিছুটা আমাদের মানতেই হবে।

—তাহলে প্ল্যানটা তোমার কি? সোহনলাল সোজা হয়ে পায়ের ওপর পা রাখল।

—অলক গোল্ডীর সঙ্গেই রানীক্ষেতে যাবে। ডিকির গলায় এবার সিদ্ধান্তের সুর।—রানীক্ষেতে ওর কাছাকাছি, ওর নজরের মধ্যেই সবসময় থাকবে ও। তবে ওদের দুজনের মধ্যে কোন যোগাযোগ থাকবে না—

—যাতে অন্য কেউ টের না পায় যে দুজনের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে, তাই ত? সোহনলাল ডিকির ইঙ্গিত বুঝতে পেরে তারপর জিজ্ঞেস করল, তবে এতে কি গোল্ডী রাজী?

ডিকি গম্ভীরভাবে জবাব দিল—রাজী ওকে করাতে হবে। কাল অলক ওর অ্যাডভান্সটা দিতে গিয়ে কায়দা করে ঐটুকু বোঝাতে পারবে। তুমি সে নিয়ে ভেব না, সোহনলাল। তার আগে এসো, আমাদের পুরো স্কিমটা আজ তৈরী করে ফেলি। ডিকি টেবিলের কাগজপত্রের মধ্য থেকে একটা মোটা ভাঁজ-করা কাগজ উঠিয়ে অন্ধকারে বসা পৃথ্বিরাজের দিকে তাকাল। রানীক্ষেতের কাজের ব্যাপারে আজই প্রথম পৃথ্বিরাজকে ডাকান হয়েছে। —পৃথ্বিরাজ, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ, আজ কেন আমরা একসঙ্গে বসেছি। এই ফিফ্‌থ মার্চ থেকে সাত দিনের মধ্যে রানীক্ষেতে আমরা একটি মেয়েকে খতম করতে চলেছি। মেয়েটি হচ্ছে হোটেল ক্যারোলিনের ক্যাবারে ড্যান্সার গোল্ডী। আর খুনটা করবে তুমি। তবে সেটা তোমাকে একটা বিশেষ অবস্থায় করতে হবে যাতে শেষ পর্যন্ত যৌন উন্মাদ খুনী হিসাবে বোম্বের এক কোটিপতির ছেলে দীপক সুরায়েকা ধরা পড়ে। আমাদের আজকের আলোচনা মন দিয়ে শুনলেই সব বুঝতে পারবে। ডিকি এবার ভাঁজ-করা কাগজটা টেবিলের ওপর মেলে ধরল। ওরা দেখল ওটা রানীক্ষেতের একটা ম্যাপ। ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে ডিকি জিজ্ঞেস করল—তোমাদের মধ্যে কেউ রানীক্ষেতে গেছ?

—প্রায় দশ বছর আগে আমি একবার গিয়েছিলাম। প্রথম জবাবটা সোহনলাল দিল।

—অলক?

ডিকির প্রশ্নে অলক নড়ে চড়ে বসল। —গিয়েছিলাম চার বছর আগে, তবে খুব অল্প সময়ের জন্যে।

পৃথ্বিরাজের কোন জবাব এল না।

—গুড। তাহলে তোমাদের তিনজনের মধ্যে দুজনেই জায়গাটা চেন।

ডিকির মন্তব্য শুনে অলক একটু অবাক হয়ে তাকাল। —তাহলে সোহনলালও যাচ্ছে ?

—হ্যাঁ, জবাব দিল ডিকি। —গোল্ডীর বায়নার জন্যে আগের প্ল্যানটা একটু পালটাতে হয়েছে। কথা ছিল তুমি ও পৃথ্বিরাজ খুনের আগের দিন রানীক্ষেতে একসঙ্গে যাবে ও গোল্ডীর চোখের আড়ালে এক সঙ্গে থাকবে। কিন্তু এখন সেটা হচ্ছে না। পৃথ্বিরাজ ওখানে পরে যাবে আর আলাদাভাবে থাকবে। সে জন্যই সোহনলালকে পাঠাচ্ছি। ওর দায়িত্ব তোমাদের দুজনের কাজের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে সব কিছু ঠিক করা। কারণ, একটা কথা তোমরা বুঝতে পারছ যে গোল্ডী রানীক্ষেতে কবে, কোন সময়ে ও কোথায় খুন হবে তা আমরা এখান থেকে বলে দিতে পারি না। ডিকি থামল, ম্যাপের ওপর ঝুঁকে বলল—যাক, এবার তোমরা দেখে নাও রানীক্ষেতে কে কোথায় থাকছ তার হদিশ। ম্যাপের একটা জায়গায় আঙ্গুল রাখল ডিকি। —এই যে দেখছ নৈনীতাল থেকে রাস্তাটা ঢুকেছে রানী-ক্ষেতের ভেতর, এর বাঁদিকে রানীক্ষেত ম্যালে পৌছনর ঠিক আগেই একটা ভ্যালি আছে। তোমরা নিশ্চয়ই জান তার নাম গ্রীন ভ্যালি। তবে এই ভ্যালিটা এখন আর আগের মত পাইনের জঙ্গলে ভর্তি নেই ইদানীং এখানে কয়েকটা ছোট ছোট বাংলো বাড়ি হয়েছে। নৈনীতাল হাইওয়ে থেকে এই যে সরু রাস্তাটা গ্রীন ভ্যালির দিকে চলে গেছে তার ওপরই বাংলোগুলো। সবগুলো হিমালয়ান রেঞ্জকে মুখ করে দাঁড়ান। দীপক সুরায়েকা ফিফ্থ মার্চ এগুলোর মধ্যেই একটায় উঠবে। ওর বাংলোটা নেনীতাল হাইওয়ের দিক থেকে গ্রীনভ্যালি রোডের ওপর দু নম্বর বাড়ি গোল্ডীর জন্য যেটা ভাড়া করা হয়েছে সেটা তার পরেরটা অর্থাৎ নৈনীতাল হাইওয়ের দিক থেকে তিন নম্বর বাড়ি।

—এক নম্বর আর চার নম্বর বাংলোর খবর নিয়েছ ? অলক মন দিয়ে সব শুনছিল, হঠাৎ প্রশ্ন করল।

—চার নম্বর বাংলোটা বেরেলীর এক শেঠের। ওটা প্রায় সময়ই খালি থাকে। এক নম্বরটা ভাড়া দেবার জন্যই তৈরী। ডিকি ম্যাপে আঙ্গু

কতে ঠুকতে বলল, ওটাই গোল্ডীর জন্য প্রথমে ভাড়া নেবার চেষ্টা করা য়েছিল। কিন্তু পাওয়া গেল না। ভাড়া হয়ে গেছে। পেলে অবশ্য াল হত, তার কারণ বাংলোটা ম্যালের প্রায় কাছাকাছি। তাহলে মি গোল্ডীর নজরের মধ্যেই ম্যালের কোন হোটেলে ট্যুরিষ্টদের সঙ্গে শে থাকতে পারতে। যাইহোক, এখন আর ঐ বাংলো নিয়ে আমাদের াথা ঘামাতে হবে না। কারণ ওটা নৈনীতাল হাইওয়ের দিকে। ঐ ময় যদি কেউ থাকেও ওটাতে, তাতে আমাদের কাজের কোন অসুবিধে চ্ছে না। তুমি থাকছ গোল্ডীর পেছনের বাংলোয়। ওটা একটু উঁচুতে। খানে তোমাকে পুরোপুরি একা আর আলাদা থাকতে হবে।

—আচ্ছা, তাহলে অলকের বাংলোও ঠিক হয়ে আছে? সোহনলাল বাক হল।

ডিকি চোখদুটো কিছুক্ষণের জন্য বুজে তারপর ওর দিকে মেলে ধরল।

—তুমি ত জান সোহনলাল, আমি সব রকম পরিস্থিতির মোকাবিলা রার জন্য আগে থেকেই তৈরী থাকি। হ্যাঁ, বাংলোটা ঠিক করা আছে।

—আর পৃথ্বিরাজ থাকছে কোথায়? সোহনলাল একটু থতমত খেয়ে জ্ঞেস করল।

—পৃথ্বিরাজ রানীক্ষেত যাচ্ছে চারদিন পর। ও আর তুমি থাকবে ালের ওপর পিক-এন ভিউ হোটেলে। এবার আসল কথায় আসা যাক। কি একটু থেমে বলতে শুরু করল—গোল্ডী রানী-ক্ষেতে যাচ্ছে বাংলা শের এক মহারাণীর মেয়ে সেজে। যাকে সোজাকথায় বলা যায় জকুমারী! দীপকের মত ওরও এখানে বিশ্রাম নেওয়া উদ্দেশ্য। আর লকের পরিচয় হবে লখনউ-এর এক ব্যবসায়ী হিসেবে। ওরা এখান কে ফিফ্থ মার্চ রওনা হচ্ছে একই ট্রেনে তবে আলাদা আলাদা মরায়। রাস্তায় ওদের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকবে না এটা বলা বাহুল্য। নউ গিয়ে ওদের গাড়ি বদল করতে হচ্ছে। ওখানে দুঘণ্টা সময়ের মধ্যে লক ওর চেহারা পুরোপুরি পালটে নেবে। নৈনীতাল এক্সপ্রেসে ও কবারে নতুন সাজে নতুন অবস্থায় উঠবে। এর পরের রাস্তাটুকু অলক ার চোখ বাঁচিয়ে গোল্ডীর সঙ্গে কিভাবে থাকবে, আশা করি সেটা

আমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। মোটমাট ওরা এ অবস্থায় সেভেন্
মার্চ রানীক্ষেত গিয়ে পৌছচ্ছে। তার পরের দিন থেকেই গোন্ডীর কাজ শুর
হয়ে যাবে। তার মানে দীপকের সঙ্গে ভাব জমানোর জন্য পুরোদস্তু
নেমে পড়তে হবে ওকে। অলকের তখন কাজ শুধু নিজের বাংলোয় বসে
ওদের লক্ষ্য করে যাওয়া। আর সবার সন্দেহ এড়িয়ে চলার জন্য মাঝে
মাঝে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানো। বলতে বলতে ডিকি আবার সোহনলালের
দিকে চোখ ফেরাল—এর পরেই তোমরা কাঠগুদাম থেকে জীপে কর
রানীক্ষেতে পৌছচ্ছ। সেটা হল টেনথ্ মার্চ। কাঠগুদামে তোমরা জীপটা
পেয়ে যাবে। রানীক্ষেতে পৌছে তোমাদের প্রথম কাজ হল গোন্ডী
দীপক কদ্দুর এগিয়েছে সেটা আঁচ করে নেওয়া।

—অলকের সঙ্গে যোগাযোগ না করে সেটা কি আমরা বুঝতে পারব
সোহনলাল জিজ্ঞেস করল।

—পারবে। পিক-এন-ভিউ হোটেল থেকেই সেটা বুঝতে পারবে

ডিকি না ঝুঁকেই ম্যাপের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পাইপের মুখটা ঠুকল
রানীক্ষেত ম্যাপের বাঁ দিকের এই জায়গাটায় তোমাদের হোটেল। এ
দোতলায় যে ঘরটায় তোমরা থাকবে তার জানলা থেকে গ্রীনভ্যা
রোডের প্রত্যেকটি বাংলো নজরে পড়ে। তাছাড়া আরো ভালভাবে স
কিছু দেখার জন্য তোমাদের কাছে দুটো পাওয়ারফুল বায়োনোকুলা
থাকবে। তোমরা যদি সেদিনই গিয়ে লক্ষ্য কর যে গোন্ডী ও দীপকে
মেলামেশাটা এই চারদিনে দস্তুর মাফিক এগিয়ে গেছে তাহলে জানবে
অলক সেদিন রাতেই তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। এই যোগ
যোগটা তোমাদের মধ্যে কিভাবে হবে সেটাই এবার তোমরা বুঝে নাও
ডিকি পাইপের মুখটা ঘসতে ঘসতে ম্যাপের একটা বিন্দুতে এসে থাম
—গ্রীনভ্যালি রোডের এই পেছন দিকটা হচ্ছে ঘন জঙ্গল। নৈনীতা
হাইওয়ে রানীক্ষেতের কাছে এসে এই যে দেখছ বেঁকে গে
এখান থেকে এই জঙ্গলে ঢোকার একটা পুরনো রাস্তা আছে। চাঁদমার
জন্য মিলিটারীরা এই রাস্তা আগে ব্যবহার করত। এই রাস্তা দিয়ে এ
ভেতরে ঢুকলে একটা ভাঙ্গা পোল পাওয়া যাবে। ঐ পোলটা তোমাদে

তিনজনের দেখা করার জায়গা। পিক-এন-ভিউ হোটেলে বসে অলকের বাংলো থেকে যে রাতে টর্চের তিনটে ফোকাসিং তোমরা পাচ্ছ সে রাতে তোমাদের এখানে দেখা করার কথা। সেদিনই তোমরা বসে ঠিক করবে গোল্ডীর মৃত্যুর সময়, জায়গা, সবকিছু। খুব দরকার নাহলে এই একদিন ছাড়া তোমরা তিনজন রানীক্ষেতে আর একসঙ্গে হবে না।

—পোলটা গ্রীনভ্যালি রোড থেকে কতদূর ? অলক গালে হাত দিয়ে জানতে চাইল।

—মিনিট দশেকের রাস্তা। জবাব দিল ডিকি। পিক-এন-ভিউ থেকে কুড়ি মিনিটের মত লাগবে।

—তাহলে, অলক জোরে একটা শ্বাস নিয়ে বলল, শেষদিনের আসল কাজটার জন্য গোল্ডীর সঙ্গে আমাকে যোগাযোগ করতে হবে নিশ্চয় ?

—ইউ আর রাইট। ডিকি সামনের খোলা ম্যাপটা ভাঁজ করে এক পাশে সরিয়ে রেখে গম্ভীর ভাবে বলল, ওটা তুমি করবে আসল কাজের ঠিক আগের দিন। এজন্য ওকে একটা ফোন করা ছাড়া উপায় নেই। সেই ফোনে গোল্ডীকে শেষদিনের জন্য দীপকের সঙ্গে এমন একটা প্রোগ্রাম ঠিক করতে বলবে যেটা তোমাদের কাজের পক্ষে সুবিধের হয়। ফোনটা তুমি করবে ম্যালের কোনো দোকান থেকে। এছাড়া তোমার সঙ্গে গোল্ডীর আর কোন যোগাযোগ হবে না। সেজন্য এই ফোনের ব্যাপারটা যাতে ধরা না পড়ে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। এরপর সবশেষে আমি গোল্ডীর মৃত্যুর বিষয়ে দু'একটা কথা বলে নিতে চাই।

ডিকির ভরাট গলা শুনে টেবল-ল্যাম্পের আড়ালে পৃথ্বিরাজ নিঃশব্দ সরীসৃপের মত নড়েচড়ে বসল। গোল্ডী-খুনের প্রস্তুতির আলোচনা শুনতে শুনতে ও প্রায় নির্জীব হয়ে গিয়েছিল। আসল কাজ সম্বন্ধে ডিকির কথা শোনার জন্য এবার সজাগ হয়ে বসল।

ডিকি কারো দিকে না তাকিয়েই বলল—গোল্ডীর খুনের সময় ও পরিবেশ তোমরা ঠিক করবে শুধু একটা কথা মাথায় রেখে, খুনের সব সূত্র যেন দীপক সুরায়েকার বিরুদ্ধে যায়। তার মধ্যে এতটুকু ফাটল রাখলে চলবে না। মেয়েটার খুনের ধরন দেখে সবাই যেন বুঝতে পারে যে ওটা

খুনের জন্য খুন নয়, বরং দীপকের যৌন-বিকৃতির একটা নিষ্ঠুর পরিণতি
এ ব্যাপারে আমি পৃথ্বিরাজের সঙ্গে আলাদা কথা বলে নেব। এ ছাড়া
তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে রানীক্ষেতে তোমাদের এই কদিনের
উপস্থিতি কেউ যেন টের না পায়। সে শত্রুই হোক মিত্রই হোক্। মনে
রেখ, রানীক্ষেতে অন্যান্য হিলস্টেশনের মত ভীড় না হলেও এলাকাটা খুব
ছোট। চারদিকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলাফেরা করতে হবে। কারো
নজরে পড়লেই বিপদ মারাত্মক। কাজ শেষ হলে পর ওখান থেকে
তোমরা কিভাবে সরে পড়বে সেটাও তোমরা ঐ পোলের মিটিঙে ঠিক করে
নেবে। আশা করি, সবকিছুই তোমাদের ঠিকমত বোঝাতে পেরেছি
বলেই ডিকি উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওকে থেমে যেতে হল।

—একটা কথা পরিষ্কার হল না ডিকি। অলকের গম্ভীর স্বর ডিকির
দৃষ্টি আকর্ষণ করল।—পুলিস এসে সবকিছুই না হয় দীপকের বিরুদ্ধে
পেল, কিন্তু খোঁজ নিয়ে যখন ওরা জানবে, যে মেয়েটি খুন হল সে আসলে
রাজকুমারী নয়, একজন ক্যাবারে ড্যান্সার তখন ওর এই ছদ্মবেশ পুলিসের
কি টনক নড়াবে না? ওরা তো ভাববে গোল্ডী এই নকল বেশ নিল কেন

অলকের প্রশ্ন শুনে ডিকির ঠোঁটে পাতলা একটা হাসি এসে গিয়েছিল
মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে গম্ভীর করে নিল ডিকি। একটু থেমে বলল-
দীপক সুরায়েকা নিষিদ্ধ জগতের মেয়েদের ওপর রক্তাক্ত অত্যাচার করে
আনন্দ পায়। এ কথাটা ওর আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ছাড়াও পুলিস পর্যন্ত
জানে। সেজন্যই আমরা আমাদের কাজে একজন ক্যাবারে ড্যান্সারকে
নিয়েছি। আমরাও চাই যে শেষ পর্যন্ত মৃত গোল্ডী ক্যাবারে ড্যান্সার
হিসেবেই প্রমাণিত হোক। পুলিসের চোখে কেসটা যা দাঁড় করাতে হবে
এই, দীপক নিজেই কলকাতার ক্যাবারে-গার্ল গোল্ডীকে কয়েকদিনের
আনন্দের জন্য রানীক্ষেতে নিয়ে গেছে। কিন্তু সবাইকে বিশেষ করে
নিজের জ্যাঠাকে ভাঁওতা দেবার জন্য ও নিজেই গোল্ডীকে রাজকুমারী
সাজিয়েছে। পুলিস এসব প্রমাণ পাবে গোল্ডীর এখান থেকে রানীক্ষেতে
যাওয়া ও সেখানে থাকার সব খরচের হিসাব-পত্র দেখে।

—কি রকম? সোহনলালের কাছে ব্যাপারটা বড় হেঁয়ালীর লাগে

জিজ্ঞাসার চিহ্ন অলকের চোখেও ফুটে উঠল।

—গোল্ডীকে কলকাতা থেকে রানীক্ষেতে নিয়ে গিয়ে সেখানে বাংলো ভাড়া করে রাখার সব ভার নিয়েছে 'দি সফ্‌ট ওয়েজ ট্রাভেলিং'। এর খরচা বাবদ ওরা যে চেকটা পাবে সেটা দীপকের নিজস্ব একাউন্টের। ডিকি শেষ পর্যন্ত ওদের কৌতূহল নিবৃত্ত করল।—প্রদীপ সুরায়েকা দীপকের পার্সোনাল সেক্রেটারীর যোগসাজসে এসব ব্যবস্থা করে রেখেছে। অতএব বুঝতেই পারছ কাজটা যদি আমরা ঠিক ঠিক প্ল্যানমত করতে পারি, তাহলে দীপকের ছাড়া পাওয়ার কোন উপায় নেই।

ডিকি উঠে দাঁড়াল। সোহনলাল ও অলক নিজেদের কোচে গা এলিয়ে বসল। ডিকি আলমারীর দিকে এগিয়ে গেল।

নোটের চারটে বাণ্ডিল ও চারটে রেলের টিকিট নিয়ে আবার ফিরে এল। দুটো টিকিট ও একটা বাণ্ডিল সোহনলালের সামনে রাখল ডিকি। তোমাদের দু'জনের ন'তারিখের দুটো টিকিট। আর এতে তোমাদের খরচ আছে, পুরো পাঁচ হাজার। বাকি দুটো টিকিট ও দুটো বাণ্ডিল অলকের দিকে এগিয়ে দিল। এ দুটো টিকিট তোমার। এখান থেকে লখনউ অবধি তাপস মুখার্জী নামে একটা, আর একটা সুজিত বর্মা নামে লখনউ থেকে কাঠগুদাম অবধি। এ বাণ্ডিলে আছে পাঁচ হাজার, তোমার খরচা। আর এই পনের হাজারের বাণ্ডিল দুটো গোল্ডীকে দেবে। দশ হাজার অ্যাডভান্স, আর পাঁচ হাজার রাজকুমারী সাজার জন্য।

সোহনলাল ও অলক সব উঠিয়ে নিল। ওদের তিনজনের সঙ্গে ডিকিও উঠে দাঁড়াল। ঘড়িতে তখন রাত একটা বেজে কুড়ি। হঠাৎ সবাই চুপচাপ হয়ে যাওয়াতে ঘরের মধ্যে থমথমে পরিবেশটা আবার ঘনিয়ে এল। ওদের সঙ্গে দরজা অবধি এসে ডিকি পৃথ্বিরাজের দিকে তাকিয়ে বলল।—তুমি কাল রাতে একবার আসবে আমার কাছে।

সবকিছু মন দিয়ে শুনল গোল্ডী। অলকের কথার মাঝে কোন প্রশ্ন করল না। কিন্তু অলক লক্ষ্য করল যে সব শুনতে শুনতে গোল্ডীর মুখের ভাব পালটে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত অলক যখন থামল গোল্ডীর অবস্থা কিংকর্তব্য-

বিমূঢ়। গুম হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

অলক একটা সিগারেট ধরাল।—তাহলে মনে রাখবেন, পাঁচ তারিখে রওনা হচ্ছি আমরা। চেয়ারে হেলান দিয়ে ও বলল—বিকেল ছ'টায় আমাদের গাড়ী। ডুন এক্সপ্রেস।

—কিন্তু তার আগে আমার কথা আছে মিঃ মুখার্জী। গোল্ডীর গলা গম্ভীর শোনাল।

—বলুন।

—সেদিন অশোকাতে আপনি যা বললেন আর আজ যা বলছেন তাতে কোথায় যেন একটা বড় তফাৎ দেখতে পাচ্ছি।

—তফাৎ, হ্যাঁ, তাতো থাকবেই। বলে অলক সিগারেটে ছোট একটা টান দিল।—এতদিন ব্যাপারটা ছিল একটা প্রস্তাব মাত্র, আজ সেটা পরিকল্পনায় রূপ নিল। আপনিই বলুন এর পর দুটোতে একটু তফাৎ থাকবে না?

—আমার ঐ পরিকল্পনা নিয়েই আপত্তি। আমি বুঝতে পারছি না মিঃ মুখার্জী, একজনের মন রাঙ্গাতে গিয়ে এতগুলি মিথ্যের আশ্রয় আমাদের নিতে হবে কেন। কেনই বা আমি একটা এস্টেটের রাজকুমারী সাজবো আর কেনই বা আপনি আপনার বেশ পালটে আমার সঙ্গে যাবেন? কাজটা কি আরো সহজভাবে করা যায় না?

—গোড়াতেই আপনি ভুল করছেন মিস গোল্ডী। অলক মৃদু হেসে সামনের দিকে ঝুঁকে বসল।—কাজটা যাতে সহজভাবে হয় সেজন্যেই আমার এই পরিকল্পনা। আপনি বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন, যাকে ঘিরে আমাদের এই কাজ সে একটি খুব উঁচুদরের অভিজাত পরিবারের ছেলে। এ অবস্থায় আপনি যদি একটি সাধারণ মেয়ে হিসেবে তার কাছে যান তাহলে কি ভেবেছেন প্রথম ধাপেই আপনি তার মনোরঞ্জন করতে পারবেন? গোল্ডীর চোখের দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে মাথা ঝাঁকাল অলক—না, পারবেন না। তার কারণ, সমাজে ওদের একটা স্ট্যাটাস আছে, যাকে বলে পদমর্যাদা। সাধারণ মেয়ে হিসেবে ঐ মর্যাদাটুকু অর্জন করতে আপনাকে একটা ইমেজ তৈরী করতে হবে। সেটা অনেক সময়ের

ব্যাপার। কিন্তু আপনি যদি এখান থেকেই সমান মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা সেজে যান তাহলে এ ব্যাপারে এগিয়ে যেতে আমার মনে হয়, আপনার পক্ষে আরো সহজ হবে?

—তাহলেও ত মিথ্যে অভিনয় করতে হবে আমাকে।··· গোল্ডীর স্বরে এখনো দ্বিধার ভাব স্পষ্ট।

অলক একটু হাঁপ নিয়ে বলল—হ্যাঁ, মিথ্যে, তবে সে ক'দিনের জন্য? মাত্র আট কি ন'দিন। তারপর আপনি যে কে সেই, আমিও তাই। শুধু আমাদের এই কটা দিনের মিথ্যের জন্য একজন হয়তো তার মহামূল্যবান জীবনকে উপভোগ করতে শিখবে।

গোল্ডীর দৃষ্টি চিন্তিত দেখাল। ভাবতে ভাবতে কিছুক্ষণ পর ও বলল—বেশ তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু আপনাকে বেশ পালটাতে হবে কেন? আপনি ত এমনি আমার সঙ্গে যেতে পারেন।

—সে কি, আপনি ভুলে গেলেন যে ছেলেটি আমার বিশিষ্ট বন্ধুর ভাই। গোল্ডীর সহজ হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে অলক সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল।—সে আমাকে কয়েকবার দেখেছে। তাই আমারও মেক-আপ পাকা হওয়া চাই।

গোল্ডী নীচের দিকে তাকিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝে ঘসতে লাগল। অলক আর দেরী করল না। চট করে কোটের পকেট থেকে নোটের তোড়াটা এবার বার করল।

—নিন, টাকাটা রাখুন। মোট পনের হাজার। আপনার অ্যাডভান্স দশ হাজার আর বাকি পাঁচ হাজার রাজকুমারী সাজার জিনিসপত্র কেনার জন্য। চারদিন মোট সময় আছে। এরমধ্যে মাকে ভাল একটা নার্সিং হোমে ভর্তি করবার ব্যবস্থা করে ফেলুন।

গোল্ডী বেশ কিছুক্ষণ পর দৃষ্টি ওঠাল। একটু ইতস্তত করে নোটের তোড়াটা হাতে নিয়ে বলল—কিন্তু মিঃ মুখার্জী, এই মিথ্যে অভিনয়টা করতে গিয়ে দেখবেন যেন খারাপ কিছু না হয়।

অলক উঠে দাঁড়াল। সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রেতে ফেলে শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—সে ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি

সব সময় আপনার কাছাকাছিই থাকব। মনে রাখবেন পাঁচটার মধ্যে সফটওয়েজ ট্রাভেলিং এজেন্সীর গাড়ী আপনাকে নিতে আসবে।

নোটের বাণ্ডিলটা হাতে নিয়ে গোল্ডী বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছিল। এতটাকা একসঙ্গে ও জীবনে হাত দিয়ে দেখেনি। অলককে দরজার দিকে যেতে দেখে ও মুহূর্তের বিহ্বল ভাবটা কাটাল।—মিঃ মুখার্জী।

দাঁড়িয়ে পড়ল অলক। নোটের তোড়াটা সোফার উপরে ছুঁড়ে গোল্ডী এগিয়ে এল। —আপনি যে চলে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ আমার একটু তাড়া আছে।

—ওটা ত সব সময়েই দেখলাম, তা বলে আমার বাড়ীতে এসে একটু বসবেন না?

—আজ থাক্।

—এর পর তো আর রানীক্ষেত যাওয়ার আগে আমাদের দেখা হচ্ছে না?

—না।

—তাহলে রানীক্ষেত থেকে ফিরে এসেই বসবেন?

অলক একটু চমকে গোল্ডীর চোখের দিকে তাকাল। গোল্ডী তখন চোখ নামিয়ে অলকের সুগঠিত দেহটাকে দেখছে। গম্ভীর ভাবে বলল অলক। —হ্যাঁ, ফিরে এসে।

—আর শুনুন, গোল্ডী আরো কাছে এগিয়ে এল। আমার আসল নাম কিন্তু গোল্ডী নয়. ওটা পোশাকী। আমি শোভনা, আমাকে ও নামেই ডাকবেন।

অলক বন্ধ দরজাটা এবার খুলে ফেলল। বাইরে পা বাড়িয়ে ধীর গলায় বলল—না মিস্ গোল্ডী, আপাতত পোশাকীটাই থাক্। ওটাও ফিরে এসেই হবে।

অলক আর দাঁড়াল না। নিজের অজান্তে একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। মেয়েটি জানে না রানীক্ষেত থেকে ও যে আর কোনদিনই ফিরবে না।

রানীক্ষেত।

এগারই মার্চ। দুপুর একটা। সোহনলাল ও পৃথ্বিরাজকে নিয়ে জীপটা তীব্রবেগে পিক-এন-ভিউ হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। সোহনলাল জীপের ড্রাইভিঙ সিটে বসেছিল। গাড়িটা দাঁড়াতেই পৃথ্বিরাজ ওর পাশ থেকে লাফ দিয়ে নীচে নেমে পড়ল। সোহনলাল এক ঝটকায় হ্যাণ্ড-ব্রেক টেনে একটু জিরিয়ে নেবার জন্য পেছনে হেলান দিল। কাঠগুদাম থেকে নৈনীতাল হয়ে টানা তিন ঘণ্টা জীপ চালাতে হয়েছে। পুরোটাই পাহাড়ী রাস্তা। তাই একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ও। মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে বসে চারপাশে চোখ বুলিয়ে তারপর নেমে পড়ল।

দুজনে একসঙ্গে হোটেলের ভেতর ঢুকল। কাউন্টারে নিজেদের পরিচয় দিল সোহনলাল, আমরা দিল্লী থেকে আসছি, সাকসেনা ও ভাটিয়া। আমাদের জন্য একটা কামরা রিজার্ভ করা আছে।

—জাষ্ট এ মিনিট, প্লিজ। কাউন্টারের লোকটা রেজিষ্টারের পাতা উল্টে বসল—ইয়েস স্যার, ফার্ষ্ট ফ্লোর, রুম নাম্বার ফাইভ। বলেই সে কলিং বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে ওদের ওপরে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিল।

বেয়ারার সঙ্গে দোতলায় উঠল ওরা। ডান পাশের কোণের কামরাটা রুম নম্বর ফাইভ।

প্রশস্ত ঘর। দুটো খাট তাছাড়া মোটামুটি সব রকমের আধুনিক আসবাবপত্রই আছে। হোটেলটা বিদেশী ধাঁচের তৈরী। উত্তর দিকের জানলাগুলো বেশ চওড়া, আগাগোড়া বড় কাঁচের পাল্লা লাগানো।

সোহনলাল ঘরে ঢুকেই প্রথমে একটা জানলার পাশে এসে দাঁড়াল। জানালাটা খুলে দিতেই একদমকা ঠাণ্ডা হাওয়া এল ভেতরে। তার সঙ্গে পুরো গ্রীনভ্যালীটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। সুন্দর দৃশ্য। যেন সবুজ রঙে আঁকা একখানি ছবি। সোহনলাল পর্দা উঠিয়ে ভাল করে সব দেখতে লাগল।

বহুদূরে নৈনীতাল হাইওয়ের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। যার ওপর

দিয়ে একটু আগে ওরা জীপ চালিয়ে এসেছে। নৈনীতাল হাইওয়ের ধার থেকে পাইনের জঙ্গল ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। জঙ্গলের এপারে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ছোট ছোট কাঠের বাংলো-গুলো ছড়ানো। গ্রীনভ্যালী রোডটা নৈনীতাল হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে সেই বাংলোর পাশ দিয়ে উত্তর দিকে ঘুরে গেছে। গ্রীনভ্যালী রোডের এপারে শুধু সবুজ ঢেউ খেলানো বিস্তৃত অঞ্চল। ডিকি ঠিকই বলেছে, গ্রীনভ্যালীর সবকিছুই এই হোটেল থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। গ্রীনভ্যালী রোডের প্রথম বাংলোটা দেখেই বোঝা গেল যে ওটাতে এখন কেউ থাকে না। দ্বিতীয় বাংলোটা দীপক সুরায়েকার হওয়ার কথা। ওটার রঙ সবুজ। সামনে ছোট একটা বাগান। নানা রঙের ফুলের গাছে ভর্তি। বাগানের পাশে সাদা বিলাস বহুল একটা ফোর্ড-গ্যালাক্সি গাড়ি দাঁড় করানো। তৃতীয় নীল বাংলোটা গোল্ডীর জন্য ভাড়া করা হয়েছে। গোল্ডী ও অলক চারদিন আগে এসে পড়েছে এখানে। গোল্ডী নিশ্চয় এখন বাংলোতে আছে। ওর জন্য ভাড়া করা গাড়ীটাও বাংলোর পাশে দেখা যাচ্ছে। গোল্ডীর বাংলোটা ইউক্যালিপ্টাস ও বার্চ গাছে ঘেরা। সেগুলোর নীচে ছোট সবুজ ঘাসের লন। সব শেষে গোল্ডীর পেছনের বাংলোটার দিকে তাকাল সোহনলাল। গ্রীনভ্যালীর সব বাংলোগুলোর মধ্যে ওটা সবচেয়ে ছোট মনে হল। একটু উঁচুতে হওয়ার দরুন সম্পূর্ণ বাংলোটা দেখা যাচ্ছিল।

—কিরে দেখতে পাচ্ছিস সোহনলাল? নাকি ঠোলাটা আনব? পেছন থেকে পৃথ্বিরাজ বলে উঠল।

—দরকার নেই। সোহনলাল জানলা থেকে সরে এসে বলল, এই দুপুর বেলা কারো পাত্তা পাওয়া যাবে না।

পৃথ্বিরাজ স্যুটকেস থেকে রামের বোতল বার করে বলল, রানীক্ষেত যা দেখছি ওস্তাদ, দুপুর রাত সব সমান এখানে। তারপর বোতল হাতে খোলা জানলার পাশে এসে গ্রীনভ্যালীর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—আইব্বাস, এই গ্রীনভ্যালী? তোফা জায়গা ইয়ার। ওদের দেখা মিলল?

—না বাংলোগুলো দ্যাখ আগে। সোহনলাল আবার জানলার পাশে

এসে দাঁড়াল।

—আচ্ছা ঐ যে সব খুপরীগুলো? কিন্তু গোল্ডীর কোনটা?

—একেবারে এদিকে, রাস্তার ধারে নীলটা। পাশের সবুজটা দীপকের, নীলের পেছনে—

—ঐ মাটি রাঙটা অলকের, বুঝেছি। পৃথ্বিরাজ মাথা ঝাঁকাল, কিন্তু ওরা তিনজনেই কি এখন ভেতরে সেঁধিয়ে আছে?

—দুপুর বেলা আর করবে কি।

—না উস্তাদ, ওদের ভিতর দুজন ত কোথাও এক হয়ে আছে এ আমি হলফ করে বলতে পারি। হোটেলের ছমকানো মাগীদের চিনি না? কদিন আগে মাগীটা এসেছে?

—চারদিন।

—তালে? এই চারদিনে কি শালী দীপককে কমলি করেনি বলছ?

—করলেই ভাল। সোহনলাল ঘুরে দাঁড়াল। কাজটা তাহলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।

—দাঁড়া, দাঁড়া সোহনলাল। পৃথ্বিরাজ ঝুঁকে বাইরে তাকাল।—অলকের খুপরী থেকে কে বেরিয়ে এসেছে দ্যাখ।

সোহনলাল চট করে আবার ঘুরে দেখল। বাংলোটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে উঠল—অলকই ত মনে হচ্ছে। দাঁড়া। বাইনোকুলারটা নিয়ে আসি।

তাড়াতাড়ি বাইনোকুলারটা নিয়ে ফিরে এল সোহনলাল। ওটা চোখে লাগিয়ে লেন্স ঠিক করে দেখল, হ্যাঁ অলকই বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। তবে এ অলক সে অলক নয়। ওর সারা গাল জুড়ে জাফরানী রঙের ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি, ডান ভ্রূর পাশে নকল জড়ুলটাও শক্তিশালী বাইনোকুলারে ধরা পড়ল। মাঝখানে সিঁথি কেটে চুল আচড়ানো। পরণে মোটা ঘেরের ইংলিশ-কাট প্যান্ট। সঙ্গে জহরকোট। অলককে এখন পুরোপুরি লখনউ-এর ব্যবসায়ী বলেই মনে হচ্ছে। বয়েসটাও যেন কেত্থেকে বেড়ে গেছে ওর।

বাইনোকুলারটা হাত থেকে নামিয়ে পৃথ্বিরাজের হাতে দিল সোহনলাল।

—ছাখ, চিনতে পারিস কিনা ?

পৃথ্বিরাজ কিছুক্ষণ ধরে দেখল।—হাঁবে, ছপ্পরটা ভাল পরেছে শালা। অলক বলে চিনা মুশকিল আছে। বাইনোকুলারটা ফিরিয়ে দিল পৃথ্বিরাজ —যাক ওর হুলিয়া ত পাওয়া গেল, এখন গোল্ডীর দেখা মিললেই হয়।

—মিলবে। সোহনলাল বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বলল, বিকেলেই বোঝা যাবে ওর কাজ কদ্দূর এগিয়েছে।

—হ্যাঁ পৃথ্বিরাজ মাথা দোলাল। আমিও আশী হাজার টাকা দামের মগজের কেরামতী দেখতে চাই। শালা চার পাঁচ দিনের ভিতর গোল্ডীর খোমা যদি না ওসকাতে পারি তা'লে অলকের মুখে থুকব।

—হয়েছে, হয়েছে, ও নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না সোহনলাল ধমকে উঠল। —অলক যা করার করবে তুই তোর কাজের কথা ভাব্।

—আমার ভাবনার কিছু নেই, সোহনলাল। তোমরা মাল দিখাও যখন খালাস করতে বলবে, করে দেব।

সোহনলাল কথা না বাড়িয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ গোল্ডীর দেখা মিলল। পৃথ্বিরাজ এজন্য অনেকক্ষণ থেকেই জানলার পাশে বাইনোকুলার নিয়ে বসেছিল। শুধু গোল্ডী নয়, দীপকেরও দেখা পেল ওরা।

পৃথ্বিরাজের ডাকে সোহনলাল তখন জানলার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা দেখল, দীপক ওর বাংলো থেকে বেরিয়ে গোল্ডীর বাংলোর দিকে আসছে। ছেলেটির বয়স খুব বেশী মনে হল না। তিরিশের নীচেই হবে। স্বাস্থ্য ও উচ্চতা অনেকটা অলকের মত। তবে গায়ের রঙ ধপধপে ফরসা, চোখে মুখে তীক্ষ্ণ ভাব। সব নিয়ে অভিজাত সুপুরুষ চেহারা। দীপক গোল্ডীর বাংলোর গেটের দিকে আসতেই গোল্ডী ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। পৃথ্বিরাজ যেন দম বন্ধ করে দেখল। সোহনলালের দৃষ্টিও থমকে গেল। গোল্ডী সোনালী কাজ করা সবুজ বেনারসী পরেছে। মাথায় অজন্তা ষ্টাইলে বাঁধা উঁচু খোপা। গলার নেকলেশটা চকচক করছে। কানে মনে হয় হীরের দুল। সব কিছুর সঙ্গে ওর দারুণ মুখখানা দামী মেকাপের ছোঁয়ায় কোন সত্যিকারের রাজকুমারীর চেয়েও সুন্দর দেখাচ্ছিল।

গোল্ডী দীপককে অভ্যর্থনা করে ওর বাংলোর বাগানে সাজানো চায়ের টেবিলের কাছে নিয়ে গেল। ওদের তুজনের কথা বলার ভঙ্গী ও মুখের হাসি দেখে আস্বস্ত হল সোহনলাল। দীপক গোল্ডীর বাংলোয় এসে একসঙ্গে চা খেতে বসেছে, তার মানে মেয়েটা যে এই কদিনে ওকে ভালভাবে ফুঁসলিয়েছে তাতে আর সন্দেহ রইল না। যাক্, তাহলে সব কিছুই ওদের পরিকল্পনামত এগিয়ে চলেছে। এখানে এসে গোল্ডী আদৌ দীপকের সঙ্গে ভাব জমাতে পেরেছে কি না, নাকি দীপক চিকিৎসার পর সত্যি ব্রহ্মচারী বনে গেছে এ নিয়ে আশঙ্কা ছিল ওর মনে। তাহলে চিড়িয়া ফেঁসেছে! আর চিন্তা কি? সোহনলাল চোখ থেকে বাইনোকুলার নামিয়ে নিল।

পৃথ্বিরাজ কিন্তু তখনো নিশানা লাগিয়ে আছে। গোল্ডী ছাড়া ওর যে আর কোন লক্ষ্যভেদ নেই, সেটা জানত সোহনলাল। মেয়েটাকে ও এই প্রথম দেখছে। কয়েকদিনের মধ্যেই যে ওর ছুরির খোরাক হবে তার দেহটাকে যত্ন করে জরীপ করে নিচ্ছে পৃথ্বিরাজ। সোহনলাল ওর পাথরের মত স্থির চেহারার দিকে তাকিয়ে জানলার কাছ থেকে সরে এল।

পৃথ্বিরাজ অনেকক্ষণ পরে বাইনোকুলার নামাল। টেবিলের কাছে এসে বোতলটা উঠিয়ে বেশ খানিকটা রাম ঢক ঢক করে গিলে নিল। তারপর একটু চুপ থেকে বলল—হুঁ, ডিকির পসন্দের তারিফ করতেই হবে সোহনলাল! এ ত দেখছি শালা আসলি রাজকুমারী। যা চমকাচ্ছে, কে বলবে মাগী হোটেলের খ্যামটা। তুই ঠিক করে বল ত, চিনতে পেরেছিলি ওকে?

সোহনলাল মাথা দোলাল—আগে বুঝতে পারিনি। খোলা নাচ দেখার পর ভদ্র পোশাকে এই প্রথম দেখলাম মেয়েটাকে। তবে ও যে অন্য ক্যাবারে গার্লদের মত নয় সেটা ত ডিকি বলেছিল।

পৃথ্বিরাজ আরো রাম ঢালল গলায়।—যাই বল ওস্তাদ, মাল কিন্তু এক নম্বর। এসব চিজ রাজা-বাদশাদেরই জোটে।—তালে এই পিয়ারীকে কমলি করতে চলেছি আমি?

ওর ঘোলাটে চোখ আর মুখের পৈশাচিক ভাব দেখে বাঁকা ভাবে

হাসল সোহনলাল।—দাঁড়া, দাঁড়া, তুই দেখছি এখন থেকেই চোখ ঘোরাতে শুরু করেছিস্। সবুর কর্, আরো দু-একদিন যেতে দে। তারপর পাবি তোর এক নম্বর খোরাক।

পৃথ্বিরাজ একটু চমকে সোহনলালের দিকে তাকাল। টলতে টলতে ইঞ্জিচেয়ারের কাছে এসে ধপ করে বসে পড়ে বলল, শালা তুই ঠিক বুঝেছিস। কিন্তু কি করে বুঝলি মাগীদের খুন করতে আমার ভাল লাগে?

—কেন, মেটেবুরুজের সাগিনার কথা এত তাড়াতাড়ি ভুলব আমরা?

—ও, ঐ আমসীটার কথা বলছিস? বোতলের বাকী রাম-টুকু খেয়ে মুখ বিকৃত করল পৃথ্বিরাজ। ধুত্ ওটা মাগী ছিল নাকি? হাড় ছাড়া কিছু পাই নি ওর গায়ে। শুয়ার কি বাচ্চি বেইমানী না করলে ওকে খুন করতাম থোড়াই! পৃথ্বিরাজ থেমে হঠাৎ কি যেন ভাবতে ভাবতে হাতের খালি বোতলটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। একটা ছোট বিরতির পর হঠাৎ-ই যেন বলল—তবে হ্যাঁ, একজনকে খুন করে খুব মৌজ করেছিলাম আমি। সেও ইক নম্বর চিজ ছিল, সোহনলাল।

ওর নেশাতুর চোখের দিকে তাকিয়ে সোহনলাল টেবিলের ওপর থেকে আরেকটা বোতল উঠিয়ে নিজের গ্লাশে হুইস্কি ঢালল। ও বুঝতে পারল সুন্দরী গোল্ডীকে দেখে ওর খুনী সঙ্গীটির নেশা বেশ চড়ে গেছে। তার মানে ওর সেই শিকারের কাহিনী শুনতেই হবে।

গ্লাশে চুমুক দিয়ে চেয়ারে বসল সোহনলাল।—কার কথা বলছিস্?

—সুহানা বাঈ। পৃথ্বিরাজ আয়েশের সঙ্গে নামটা উচ্চারণ করল।—বেনারসের খানকি-পট্টির সেরা সওদা। কত রহিস কত মস্তান ওর আদরের জন্য ভিখ মাঙত। ওর সাথে শোবার জন্য বড় বড় পাত্তি পড়ত ওর গালিচায়। আমি শালা ঐ ছেনালের কাছে দুবার গিয়েছিলাম। পরথম বার মাগী তাকালই না। চাকরটাকে দিয়ে ভাগিয়ে দিল। তারপর আর একবার গিয়েছিলাম। সেবার আমার বটুয়াতে ছিনতাই করা নোটের পুলিন্দা ঠাসা। তবু জানিস, মাগীর পা পড়ল না মাটিতে! বলল যার তার সঙ্গে ও নাকি ছেনালি করে না। বাস্—ওর দেমাক দেখে আমারও মাথায় খুন চাপল। একরাতে চুপচাপ ওর বাড়ীতে চড়াও হলাম। মাগী তখন

একজনকে নিয়ে বেসাতি করছে। নাগরটাকে আগে সাবাড় করলাম তারপর ছাম্মোর মুখটা চেপে ধরলাম। জানিস, আমার হাতে ছুরি দেখে ঐ দেমাকী মাগীর হালাৎ তখন একেবারে কাটা মুরগীর মত। ওফ্, ভয়ে কাঁপছিল না? হাঃ হাঃ হাঃ, তখনকার কথা ভাবতে ভাবতে পৃথ্বিরাজ বিকৃত হাসিটা অনেকক্ষণ ধরে হাসল—বুঝলি সোহনলাল, তারপর দিলাম গলা ওর সিটিয়ে যাওয়া ছিবড়িতে ছুরির পর ছুরি ভুঁকিয়ে। আঃ সেদিন মৌজ করেছি। বলতে বলতে চেয়ারের ওপর যেন নেতিয়ে পড়ল সে।

সোহনলাল ওর উত্তেজনায় লাল হওয়া মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল। তিন বছর আগের বেশ্যা-খুনের কথা ওর মনে আছে। খুনটা যে পৃথ্বিরাজ করেছিল ও তা জানত। তবে আগাগোড়া ঘটনাটা আজই ওর মুখে শুনতে পারল!

বাইরে থেকে হঠাৎ এক দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া এল ভেতরে। সোহনলাল জানলার দিকে তাকাল। আকাশে এর মধ্যে কোত্থেকে মেঘ এসে জমেছে। মনে হচ্ছে বৃষ্টি নামবে। পৃথ্বিরাজ চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। খালি বোতলটা বিছানার ওপর ছুড়ে আবার বলল—আর একটা মাগীও খুন করেছিলাম আমি। সেটা করতে হয়েছিল ডিকির জন্য। তবে ওটা ছিল বুড্ডি। ওসব খুনে মৌজ নেই, ইয়ার। স্রেফ সওদাটাই হয়। লড়কি খুপসুরত হলে আমার ছুটো পাওনাই মিটে যায়। মনে হচ্ছে এখানে তা মিলবে। কি যেন নাম চিড়িয়ার, গোল্ডী? নাঃ চিজ তোফা আছে উস্তাদ।

—তা হবে। সোহনলাল গম্ভীর হল। কিন্তু পৃথ্বিরাজ, মৌজ করার সময় এখানে পাওয়া যাবে না। বিজলীর মত কাজ সারতে হবে, বুঝলি ত?

—পৃথ্বিরাজকে নতুন খুনের পাঠ শেখাচ্ছিস? চোখ ছুটো রক্তগোল করে তাকাল পৃথ্বিরাজ।

—না, তবে কাজটা এখানে অন্যরকম তাই মনে করিয়ে দিচ্ছি। ডিকির নির্দেশ ইঙ্গিত করল সোহনলাল।

পৃথ্বিরাজের হাত ছুটো শক্ত মুঠোয় পরিণত হল। মাথা নেড়ে বলল—জানি, সব আমার ভাল করে মনে আছে। কাজটা কবে করতে হবে বল?

—দীপক-গোল্ডীর মেলামেশা আজ যা দেখলাম তাতে মনে হচ্ছে আর

বেশী দেরী নেই। সোহনলাল উঠে দাঁড়াল।—আজ রাতে অলকে সিগন্যালিঙ আসে কিনা দেখা যাক্। তার আগে চাঁদমারীর পোলটা আমাদের দেখে আসতে হবে।

—দেখে আয়। পৃথ্বিরাজ বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল, আমি আ বেরুচ্ছি না।

সোহনলাল আড় চোখে তাকাল।—জায়গাটা কিন্তু তোরই ভাল ক জেনে রাখা দরকার।

—আজকেই নিশ্চয় ছুরি চালাতে হবে না? পৃথ্বিরাজ চোখ বুজলো- কাল দিনে দিনেই ছেনে রাখবো।

সোহনলাল পোশাক পালটে বাইরে বেরিয়ে গেল।

চা খাওয়া শেষ হল ওদের। দীপক গোল্ডীকে নিয়ে ওর বাংলোর লন থেকে বেরিয়ে এল। ওরা একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তারপর পাইনের জঙ্গলে দিকে চলে গেল।

অলক ওর বেডরুমে বসে জানলা দিয়ে সব লক্ষ্য করছিল। দীপকে সঙ্গে গোল্ডীর মেলামেশার আজ নিয়ে পাঁচদিন। এ-ক'দিনে ওরা অনেকদূ এগিয়ে গেছে। অলক এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। গোল্ডীকে দিয়ে ওদে কাজ শেষ পর্যন্ত ভালমতোই হয়েছে। কলকাতায় যা ওকে শেখানে পড়ানো হয়েছিল রানীক্ষেতে এসে তার সবই ও পুরোপুরি তামিল করেছে এখানে দীপকের যে এখন গোল্ডী-ই একমাত্র সঙ্গী সেটা রানীক্ষেতে অনেকেই এর মধ্যে লক্ষ্য করেছে। আরো দুটো দিন যেতে দিলে সাক্ষী সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে নিশ্চয়। তার পরেই অলকের কাজ শেষ।

গোল্ডীর এই অভিযান শুরু হয়েছিল রানীক্ষেতে পৌছনোর পরে পরের দিন থেকে। অলকের কথামতই সেদিন ও সকালে নিজের বাংলো ফোনটা খারাপ করে দীপকের বাংলো থেকে একটা মিছে ট্রাঙ্ককল কর গিয়েছিল। সেই সূত্রে ওদের মধ্যে যে আলাপের শুরু তার শেষ গোল্ডী খুন না হওয়া অবধি হবে না সেটা ওদের ভাব জমানোর বহর দেখে বুঝতে পেরেছিল অলক। তবে তারো আর বেশী দেরী নেই। ওর যমদূ

এখন রানীক্ষেতেই হাজির। আজ দুপুরে পিক-এন-ভিউ হোটেলের জানলায় সোহনলাল ও পৃথ্বিরাজকে অলক দেখেছে।

চেয়ার থেকে উঠে একটা হুইস্কির বোতল ও গ্লাশ নিয়ে আবার ও বসল। গোল্ডী খুনের পরিবেশটা পাকাপাকি হয়ে উঠেছে। খুনের ছকটা এবার মনে মনে ভেঁজে নিতে হবে। মোটামুটি ও সব ঠিক করে রেখেছে। সোহনলালের সঙ্গে এ নিয়ে শুধু একবার কথা বলা দরকার। তবে আজ নয়, ওদের সঙ্গে দেখা করবে ও আগামীকাল।

অলক হুইস্কির গ্লাশে চুমুক দিয়ে বাঁ-পাশের জানলার দিকে তাকাল। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, গোল্ডী দীপকের সঙ্গে গল্প করতে করতে গ্রীনভ্যালী রোড ধরে বহুদূর চলে গেছে।

অলক এবার উঠে দাঁড়াল। গ্লাশের সব হুইস্কি শেষ করে নতুন গ্লাশ নিয়ে বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে এল। গোল্ডী ওর বাংলোতে বা তার কাছাকাছি যখন থাকে অলক তখন বাইরে থাকে না। বিশেষ করে ওর সঙ্গে দীপক থাকলে ত নয়ই, কারণ গোল্ডী ওকে দেখলেই মাঝে মাঝে যে ভাবে তাকায় সেটা ওর পক্ষে বিপজ্জনক।

বাইরে আকাশে গত কয়েকদিনের ছিটকে-ছড়ান মেঘগুলো দানা বাঁধতে শুরু করেছে। কালো মেঘ, আলো বেশ কমে এসেছে। বৃষ্টি নামলেও নামতে পারে। পিক-এন-ভিউ হোটেলে সোহনলালদের কামরার জানলাটা খোলা। তবে কেউ দাঁড়িয়ে নেই।

অলক ভুরু কোঁচকাল। ওরা কি গোল্ডী দীপকের এই বন্ধুত্ব লক্ষ্য করেনি? নিশ্চয়ই করেছে। পৃথ্বিরাজ হয়ত এতক্ষণে গোল্ডীর পুরো মাপ-জোঁক নিয়ে ভেতরে ছুরি শানাতে বসে গেছে। হ্যাঁ, আর মোটে দু'দিন বাকি। বাস্, তারপরেই পাঁচ লাখ টাকার কারবারের সমাপ্তি। পুরো আশী হাজার টাকা হাতে পাবে অলক। তারপর রানীক্ষেতের মত এরকমই একটা জায়গায় ওকে বিশ্রাম নিতে হবে। ডিকি, পৃথ্বিরাজ, সোহনলাল এদের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে কয়েকদিন কি রকম কাটে দেখা যাক।

আচ্ছা, তখন যদি ওর সঙ্গে গোল্ডীর মত একটা মেয়ে থাকত, কেমন হত? অলক চমকে উঠল। গ্লাশটা বোধ হয় হাত থেকে পড়েই যাচ্ছিল,

কোনমতে নিজেকে সামলে গত চারদিনের নতুন ভাবনাকে মনের মধ্যে ও আবার মিলিয়ে দিতে চাইল। ভাবনাটা বিপজ্জনক। অলকের মত ছেলের পক্ষে এ ঝোঁক বেমানান।

সারা গ্রীনভ্যালী ছাপিয়ে হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত বইতে শুরু করেছে। দূরে পাইনের জঙ্গলে পাতার সরসর শব্দ শোনা যাচ্ছে। বৃষ্টি এখানে না নামলেও কাছাকাছি কোথাও হচ্ছে।

সামনে গোল্ডী ও দীপকের বাংলো ছাড়িয়ে বিশাল সবুজ ভ্যালীটার দিকে তাকাল অলক। ওরা এতক্ষণে ভ্যালীর নির্জনতায় নেমে গেছে নিশ্চয়। অলকের মনে পড়ল, ঠিক এ ভাবেই ওকেও গোল্ডীর সঙ্গে নৈনীতালে ঘণ্টাখানেক কাটাতে হয়েছিল। কলকাতায় গোল্ডীর সঙ্গে পরিচয় হবার পর এখন পর্যন্ত মাঝের সেই দু'ঘণ্টা অলকের কাছে বিস্ময়। একটা নতুন অনুভূতির যখন জন্ম হয়েছিল ওর মধ্যে। সেই অনুভূতিটাই অলকের মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যাবার মূলে।

গোল্ডীর মৃত্যুর অবধারিত পরোয়ানা নিয়ে পৃথ্বিরাজরা এসে পড়েছে রানীক্ষেতে। অলকের এবার সবকিছুই ওদের হাতে তুলে দেবার কথা চারদিন পর হঠাৎ আজ অলক কেন যেন সেই ঘটনাটা ভাবতে বসল।

ঘটনাটা ঘটেছিল কলকাতা থেকে আসার পথে, নৈনীতালে। কাঠগুদাম অবধি ট্রেণে করে ওরা বেশ নির্ঝঞ্ঝাটেই এসে পৌঁছেছিল। ডুন্-এক্সপ্রেস ও নৈনীতাল-এক্সপ্রেস দুটো ট্রেণেই গোল্ডীর সঙ্গে অদৃশ্য সঙ্গী হয়ে অলককে কোন অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে হয়নি। শান্ত-শিষ্ট গোল্ডী বাধ্য মেয়ের মত পথে সব কথা রেখেছে। অলকের সঙ্গে সারা রাস্তায় কখনো কোথাও যোগাযোগ করার বা কথা বলার চেষ্টা করে নি। মাঝে মধ্যে দেখা হওয়ার সময় একটু বেশী করে তাকিয়েছিল এই যা।

কাঠগুদাম থেকে গোল্ডীকে নিয়ে তখন সফ্‌ট ওয়েজ ট্রাভেলিং এজেন্সীর বিরাট কমাণ্ডার গাড়িখানা নৈনীতালের দিকে ছুটছে। তার পেছনে একটা জীপের পরেই ছিল অলকের ট্যাক্সী।

নৈনীতালের প্রায় আধাআধি রাস্তা গাড়িদুটো প্রায় একই দূরত্ব রেখে

চলছিল। এরমধ্যে গোল্ডী ঘাড় ফিরিয়ে দু'একবার উইণ্ড স্ক্রীন থেকে অলকের ট্যাক্সীটাকে দেখেছে। কমাণ্ডার গাড়িটা অলকের চোখের সামনে বরাবর থাকলেও কারোর বোঝবার উপায় ছিল না যে অলক ওটা অনুসরণ করে চলেছে। কিন্তু হঠাৎ অর্ধেক রাস্তার পরেই গোল্ডীর গাড়িটা ওর চোখের আড়ালে চলে গেল। বোধহয় বেশী স্পীড নিয়ে ফেলেছিল। তাই অলকের ট্যাক্সীটা যখন এঁকেবেঁকে কয়েকটা মোড় পেরিয়ে সোজা রাস্তায় এল, তখনো ও গাড়িটার দেখা পেল না।

এই ছাড়াছাড়ি অবস্থায় শেষ পর্যন্ত ওর ট্যাক্সী নৈনীতাল সহরে এসে ঢুকল। প্রায় আধঘণ্টার মত কমাণ্ডারটার দেখা না পেয়ে অলক তখন একটু চিন্তিত। হঠাৎ নৈনীতাল-রানীক্ষেত হাইওয়ের মোড়ে এসে একটা বড় ভীড় দেখে অলক চঞ্চল হয়ে পড়ল। কারণ ঐ ভীড়ের ফাঁক দিয়ে কমাণ্ডারের কিছুটা দেখা যাচ্ছিল। ভীড়টার পেছনে আরো কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে।

অলকের ট্যাক্সীটা জ্যামের শেষে দাঁড়াতেই ও চট করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। ধীরে ধীরে ভীড়ের কাছে গিয়ে সন্ত্রস্ত চোখে দেখল অলক, ওটা একটা একসিডেন্ট। কমাণ্ডারটা একটা অ্যামবাসাডারের পাশে ধাক্কা মেরে দাঁড়িয়ে আছে। গোল্ডী অপ্রস্তুত অবস্থায় গাড়ির মধ্যে বসে। একসিডেন্ট আর ভীড় দেখে ও তখন বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছে। অলককে দেখতে পেয়েই গোল্ডী প্রশ্নসূচক ভঙ্গীতে তাকাল। অন্যদিকে চোখ সরিয়ে অলক ভীড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গেল।

একসিডেন্টটা দেখল অলক। অ্যামবাসাডারের চেয়ে কমাণ্ডারের ক্ষতি হয়েছে বেশী। অ্যামবাসাডারের বাফারটা কমাণ্ডারের বনেট ভেদ করে একেবারে ভেতরে ঢুকে গেছে। তাছাড়া কমাণ্ডারের সামনের বাঁপাশের চাকাটাও দোমড়ান। তার মানে গাড়িটাকে চলার অবস্থায় আনতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে।

অলক গম্ভীর মুখ নিয়ে পেছিয়ে এসে গোল্ডীর দিকে আড়চোখে তাকাল। ওর মুখের লক্ষণ তখন ভাল নয়। ভীতু মেয়েটাকে ঘাবড়ে দেবার জন্য চারপাশে রসদ বেশ জমে উঠেছে। একসিডেন্টটাও মারাত্মক।

সারা রাস্তায় গোল্ডী যা করে নি এবার তাই করতে গেল। অলক সঙ্গে সঙ্গে ইশারায় থামিয়ে দিল ওকে। গোল্ডী কিছু বলতে পারল না।

অস্থির মন নিয়ে রাস্তার পাশে পান-সিগারেটের এক দোকানের কাছে এসে দাঁড়াল অলক। ওদের দীর্ঘ যাত্রার শেষে একটা ঝামেলা শেষ পর্যন্ত বাধল। যা একসিডেণ্ট, পুলিস-কেস যে হবে তাতে সন্দেহ নেই। মুশকিলটা হবে তখনই। গোল্ডী এমনিতেই ঘাবড়ে গেছে, পুলিস দেখে কি বলতে গিয়ে কি বলে বসবে কে জানে। হয়ত অলককেই দেখিয়ে দেবে।

চোখের কোলছুটো কেঁপে উঠল অলকের। দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে মুহূর্তের মধ্যে সব ভেবে নিল। পকেটের পুরোনো প্যাকেটটা বের করে একটুকরো কাগজ ছিঁড়ে তক্ষুনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছু-লাইন লিখল তার ওপর।

'গাড়িটা সারানো অবধি ঘুরে আসছি—ড্রাইভারকে এই কথা বলে নৈনীতাল লেকের দিকে চলে আসুন। আমি ওখানে আছি।'

কাগজের টুকরোটা লিখেই অলক ট্যাক্সীটার দিকে গেল। ছোট এ্যাটাচি কেশটা ভেতর থেকে বের করে ট্যাক্সীর পাওনা মিটিয়ে দিল প্রথমে। তারপর ও আবার কমাণ্ডারের ভীড়ের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

সবার চোখ বাঁচিয়ে গোল্ডীর খোলা জানলা দিয়ে ছোট কাগজের টুকরোটা ওর কোলের ওপর ফেলতে কোন অসুবিধে হোল না। এবার ও নৈনীতাল লেকের দিকে পা বাড়াল।

লেকের ধারে স্নো-পিক এর নির্জন তলায় অলক গোল্ডীকে পেছন পেছন নিয়ে চলে এল। খুব সতর্ক হয়ে চারপাশে লক্ষ্য রেখে তারপর ও গোল্ডীর সঙ্গে একসাথে হল। এভাবে ওদের একসঙ্গে হওয়ায় বিপদ যে প্রচুর, জানত অলক। তবু উপায় নেই। একসিডিণ্টের জায়গায় গোল্ডীকে ঐভাবে ফেলে রাখলে ঝুঁকি আরো বেড়ে যেত। কিছুক্ষণ ওকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে রাখতেই হবে।

স্নো-পিক-এর রাস্তা দিয়ে একটু ওপরে উঠে প্রথমে ওরা একটা ঝোপের মধ্যে গিয়ে বসল। সেখানে বসে মেয়েটার সঙ্গে আলতু-ফালতু গল্প করতে হল অলককে। কাজের কোন কথা ছিল না, তাই গোল্ডীর অনেক আজে-

নাজে প্রশ্নের সত্যি-মিথ্যে জবাব দিতে হচ্ছিল।

কথার ফাঁকে ফাঁকে গোল্ডী ওর গভীর দৃষ্টি নিয়ে অলকের দিকে তাকাচ্ছিল। ওর পুরুষত্ব, ওর ব্যক্তিত্বকে যেন মেয়েটা বসে বসে আহরণ করছিল তখন। এরই মধ্যে কয়েকবার সেই স্নিগ্ধ চোখ দুটোর সঙ্গে অলকের চোখাচোখি হল। এমন চোখ যার দৃষ্টি ভাবনার সৃষ্টি করে মনে!

আধঘণ্টার মত ওরা বসেছিল ওখানে। দু-একটা লোকের আনাগোনা আশেপাশে শুরু হতেই অলক গোল্ডীকে নিয়ে স্নো-পিক-এর ওপর উঠতে লাগল। তবে যে পথে সবাই ওঠে, সে পথে নয়। ভবিষ্যতের নিরাপত্তার খাতিরে মাঝে মাঝে অলক পাহাড়ী জঙ্গলের মধ্যে নেমে পড়ছিল।

সেই সব নির্জন রাস্তায় গোল্ডীর সঙ্গে চলতে গিয়ে অলক যেন ওর জগৎ থেকে কিছুক্ষণের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। এমন অনেক কিছু তখন করতে হল ওকে, যা কোনদিন ও করবে বলে ভাবেনি। উঁচু নীচু পাহাড়ী রাস্তায় গোল্ডীকে হাত ধরে সামলাতে হচ্ছিল। কোথাও শক্ত খাড়াইয়ে উঠতে গিয়ে ওর সম্পূর্ণ দেহটাকে প্রায় জড়িয়ে ধরতে হল। আবার কখনো গোল্ডীর আবদার রাখার জন্যে উঁচু জংলী গাছ থেকে ফুল পর্যন্ত পেড়ে দিল।

মোদ্দা, হাসাহাসি ও ছোটাছুটি করতে করতে ঐ ঘণ্টা দুয়েক অলক যেন ওর সংরক্ষিত জীবনটাকে গোল্ডীর জন্য খুলে দিয়েছিল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অলক লাউঞ্জ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। জমাট বাঁধা মেঘের জন্য গ্রীনভ্যালীর কোলে সন্ধ্যের অন্ধকার তাড়াতাড়ি নামতে শুরু করেছে। এদিক ওদিক আলোর বিন্দুগুলো ছড়িয়ে পড়ছে। নৈনীতালের সেই সময়টুকুর কথা ভাবতে ভাবতে অলক যেন ভুলতে বসেছিল যে গোল্ডী ও দীপকের ফেরার সময় হয়ে গেছে। এখন ওকে বাংলোতে ঢুকে পড়তে হবে।

গোল্ডীকে নিয়ে বারবার ওর এভাবে আনমনা হয়ে যাওয়াটা অলক বরদাস্ত করতে চাইল না। কয়েকদিন বাদে যাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলবার নির্মম চক্রান্ত চলছে তার প্রতি নরম হলে চলবে না। ওকে সম্পূর্ণ উদাসীন হতে হবে। এ কথা ভেবেই অলক ডিকির দেওয়া গোল্ডী ও দীপকের বাংলোর ছকটা ভাল করে ঝেলে নেবার জন্য ভেতরে ঢুকল।

সন্ধ্যের একটু আগে সোহনলাল চাঁদমারীর পোলটা দেখে ফিরে এল। পৃথ্বিরাজ তখন আরো মাল টেনে মোষের মত ধুকছে। দরজা খুলেই ও আবার বিছানায় গড়িয়ে পড়ল।

সোহনলাল ওর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চেপে আপনমনে একটা বিদ্রূপের শব্দ করল। পৃথ্বিরাজের বড় দোষ, ও কাজের গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে কখনো ভাবে না। পরিকল্পনার জটিল ব্যাপারে ও মাথা ঘামাতে চায় না। এ জন্যই সোহনলালকে আসতে হয়েছে ওর সঙ্গে। অবশ্য খুনের সময় খুনটা ও নিখুঁত ভাবে করবে। তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে পৃথ্বিরাজের জুড়ি মেলা ভার। তবে খুনের আগে ও পরের দরকারী বন্দোবস্তগুলো সোহনলালকে একাই করতে হবে। একমাত্র অলকের সঙ্গে দেখা হলে পর এ বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যাবে।

সোহনলাল জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। গ্রীনভ্যালীতে ছায়া-ছায়া অন্ধকারটা বেশ জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছে। সারা আকাশ জুড়ে কালচে মেঘের ছড়াছড়ি। দূর থেকে পাইনের জঙ্গলগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন এক একটা প্রাগৈতিহাসিক জন্তু ওৎ পেতে আছে।

অলকের সংকেত কি আজ পাওয়া যাবে? সোহনলাল ওর বাংলোটা নিরীক্ষণ করবার চেষ্টা করল। অন্ধকারে কিছু বোঝা গেল না। অলক আর গোল্ডী মোট চারদিন হল এখানে এসেছে। এরমধ্যে গোল্ডী ঠিক কোন্ দিন থেকে দীপকের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে কে জানে? কয়েকটা দিন অন্তত দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা আরো গাঢ় করতে দিতে হবে। তা না হলে দীপকের হাতে গোল্ডী খুনের বিশ্বাসযোগ্য পরিস্থিতি তৈরী করা যাবে না। অলকের মাথায় সে চিন্তা আছে নিশ্চয়। তবু সোহনলাল জানলার পাশে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। বলা যায় না আজ রাতেও অলকের বলার কিছু থাকতে পারে।

কিন্তু সে রাতে সংকেত এল না। সোহনলাল ও পৃথ্বিরাজ জানলায় রাত এগারটা পর্যন্ত পালা করে বসেছিল। অলকের বাংলোর দিকের অন্ধকার ভেদ করে কোন আলো ফুটে উঠল না।

পরের দিন সকালেই সোহনলাল ওর কাজ শুরু করে দিল।

আজ রানীক্ষেতে গোষ্ঠীর পঞ্চম দিন। তার মানে আর দু তিন দিনের মধ্যে ওদের চরম দিনটি এসে যাচ্ছে। অলকের সংকেত যে আজ পাওয়া যাবে এ ব্যাপারে সোহনলাল নিশ্চিত। কারণ ডিকির নির্দেশই আছে সাত-আট দিনের বেশী দেরী করা যাবে না।

সোহনলাল প্রথমে জানলা দিয়ে গ্রীনভ্যালীর অবস্থানটা পৃথ্বিরাজকে ভাল করে বুঝিয়ে দিল। গতকাল ও চাঁদমারীর পোল দেখে আসার সময় ওপাশটা মোটামুটি ঘুরে এসেছে। খুনটা খুব সম্ভব পৃথ্বিরাজকে দীপক বা গোষ্ঠীর বাংলোর মধ্যেই করতে হবে। বাংলোদুটোর ভেতরের নক্শা ও পুরো বিবরণ ডিকি ওদের দিয়ে রেখেছে। এখন শুধু জানতে হবে ঐ বাংলোগুলোর পেছন দিকের সঙ্গে নৈনীতাল হাইওয়ের যোগাযোগটা কিরকম। অবশ্য অলকের সঙ্গে দেখা হলে পর পুরো ছবিটাই পাওয়া যাবে।

কিন্তু অলকের সাথে দেখা হওয়ার আগেই ওদের ভীষণ অবাক করে দিয়ে সেদিন একটা ঘটনা ঘটে গেল। এর জন্য ওরা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। রানীক্ষেতে ওদের আসার দ্বিতীয় দিনেই এরকম ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে তা পৃথ্বিরাজ পর্যন্ত ভাবতে পারে নি।

সোহনলাল পৃথ্বিরাজকে সঙ্গে করে ওর কাজের এলাকার চাক্ষুষ বিবরণ দেবার জন্য হোটেল থেকে বেরিয়েছিল। গ্রীনভ্যালীর পেছনের জঙ্গলটা পুরোপুরি ঘুরে দেখতে ওদের দুপুর দুটো বেজে গেল। তখন ওরা ম্যালের দিকে ফিরছে। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে দুজন নৈনীতাল হাইওয়ের ওপর দিয়ে হাঁটছিল।

রানীক্ষেত সত্যি খুব ছোট জায়গা। এখানে এখন যা ট্যুরিস্ট আছে তা গোনাগুণতি। চলতে ফিরতে প্রত্যেকেই চোখে পড়ে যায়। যদিও এই সুদূর হিলস্টেশনে ওদের পরিচিত কারোর সঙ্গে দেখা হতে পারে এমন আশঙ্কা ওরা করছিল না। তবু দূর থেকেই প্রত্যেককে ওরা নিরীক্ষণ করতে করতে চলছিল। সেই নিরীক্ষণের দৃষ্টিটা দূরে একটা ট্যাক্সীর ওপর দিতে গিয়ে সোহনলাল থমকে দাঁড়াল। জোরে যেন একটা হোঁচট খেল

ও। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে পৃথ্বিরাজের হাতটা ও সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলল।—পৃথ্বিরাজ!

ওর চাপা সতর্ক স্বরে পৃথ্বিরাজ ঘুরে দাঁড়াল।—কি হল?

—মেয়েটা কে? লুসি না? দূরে ট্যাক্সীটার দিকে ইশারা করল সোহনলাল।

পৃথ্বিরাজের চোখ বিজলীর মত ছুটে গেল সেদিকে। ট্যাক্সীটা রাস্তার ওপারে একটা হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে। তার পেছনের সীটে যে মেয়েটা বসে আছে তাকে জানলা দিয়ে মোটামুটি দেখা যায়। তবে পুরোপুরি নয়। ওরা দুজনে রাস্তার ধারে সরে এসে ওদের দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ণ করল।

একটু পরেই মেয়েটা বাইরে দাঁড়ান ট্যাক্সী-ওয়ালাকে কি যেন বলতে গেল। তখনই ওরা স্পষ্ট দেখতে পেল, যে ওদের অনুমান ঠিক।

পৃথ্বিরাজের গলার আওয়াজ ওকে দেখামাত্র বদলে গেল।—হ্যাঁ, লুসি। কিন্তু এখানে ও কি করছে, সোহনলাল?

—চুপ কর। সোহনলাল পৃথ্বিরাজকে ঠেলা দিল—ঐ পানের দোকানটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়া। এ নিয়ে পরে ভাবা যাবে।

আর দেরী না করে চটপট দুজনে দোকানের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

যে হোটেলের সামনে ট্যাক্সীটা দাঁড়ান আছে তার নাম রেক্স। রাস্তার এপারে ওদের পিক-এন-ভিউ হোটেল। রেক্সটা নৈনীতাল হাইওয়ের দিকে একটু পেছিয়ে ঠিক উল্টো মুখো।

লুসির ট্যাক্সীটা লক্ষ্য করে ওরা বুঝল যে ওটা সবে রানীক্ষেতে এসেছে। লুসির সঙ্গী বোধহয় হোটেল রেক্স-এ ঢুকেছে। লুসি নিশ্চয় তারই অপেক্ষায় বসে আছে ট্যাক্সীতে।

আর সত্যিই তাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই দামী শার্ট-প্যান্ট পরা এক মাঝবয়েসী ভদ্রলোক হোটেল থেকে বেরিয়ে এল। তার সঙ্গে হোটেলের একটা বেয়ারা। বেয়ারাটা ট্যাক্সীর ট্রাঙ্ক খুলে ওদের জিনিসপত্র নামাতে শুরু করল। তার মানে এরা হোটেল রেক্সেই উঠছে। সোহনলাল ও পৃথ্বিরাজ পরস্পরের দিকে তাকাল। লোকটা যে লুসির এক ধনী শেঠ খদ্দের সেটা বুঝতে ওদের বাকী রইল না। লুসিকে ওরা ভাল করেই চেনে।

সঙ্গীর পকেট লুটে মজা করতেই এই নির্জন জায়গায় ওর যে আগমন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

লুসি ও তার সঙ্গী হোটেলের ভেতর ঢুকে যাওয়া অবধি ওরা সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর গম্ভীর মুখে আরো সতর্ক হয়ে নিজেদের হোটেলের দিকে চলতে শুরু করল।

হোটেলে নিজেদের কামরায় সোহনলাল তখন চিন্তিত অবস্থায় বসে আছে। পৃথ্বিরাজ গুম হয়ে টেবিলের কানায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। দুজনের মাথায় তখন ঘুরপাক খাচ্ছে ডিকির সাবধান-বাণী—রানীক্ষেতে তোমাদের এই কদিনের উপস্থিতি কেউ যেন টের না পায়।

পৃথ্বিরাজ টেবিলের কাছ থেকে সরে এল। —ব্যাপারটা ত বড় ঘোটালা পাকাল, সোহনলাল? ভারী গলায় ও বলল, শালা এই জঙ্গলেই ছুঁড়িটা এল শেষতক্!

সোহনলাল ভাবতে ভাবতে তাকাল ওর দিকে। —তোর কি মনে হয়? লুসির এখানে আসার কারণ কি হতে পারে?

—সেটাও বলতে হবে? ঐ ফেরীওয়ালাকে তুই চিনিস না?

—কিন্তু জায়গা ত আরও অনেক ছিল। রানীক্ষেত কলকাতার কাছে নয়।

—ভদ্দরলোক নাগরদের বেসাতি করতে একটু দূরেই যেতে হয় সোহনলাল। লোকটাকে দেখে বুঝলি না, মাল রহিস আছে। শালা নরম-গরম বদন নিয়ে খরচা করেই মৌজ করতে এসেছে।

সোহনলাল চুপ হয়ে বসে আরো কিছুক্ষণ ভাবল। লুসি শুধু কলকাতার মেয়ে নয়, ওরা যে মোহল্লায় ঘোরাফেরা করে সেখানকারই বাসিন্দা। রানীক্ষেতে ও যে জন্যেই আসুক, বেড়াতে বা মৌজ করতে, ওর এখানে আসাটাই ওদের কাছে এখন ঝুঁকির প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। সোহনলাল, পৃথ্বিরাজ ও অলক তিন জনেই এখন রানী-ক্ষেতে। তিনজনকেই ছুঁড়ি ভাল করে চেনে। রানীক্ষেতের মত ছোট জায়গায় চারজন একসঙ্গে একদিনও থাকলে, দেখা হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক। ভাবতে ভাবতে সোহনলাল একটু অস্থির হয়ে উঠল। নিরিবিলিতে সবার

চোখের আড়ালে কাজটা ওদের সেরে চলে যাবার কথা। লুসি কি বাধা হয়ে দাঁড়াবে?

—পৃথ্বিরাজ! সোহনলালের ডাকে পৃথ্বিরাজ ঘাড় ফেরাল। অলকের সিগন্যালিং আজ যদি না আসে ওকে আমাদেরই ফোকাসিং করতে হবে। লুসির জন্য অলককে সাবধান করে দেওয়া দরকার।

—আলবাত্। পৃথ্বিরাজ মাথা নেড়ে সমর্থন করল ওকে।—কিন্তু ও শালা লুসির আওতা থেকে একটু দূরে আছে। এদিকে মাগী যে আমাদের নাকের ডগায় ডেরা ডালল, তার কি হবে?

—রাতের আগে হোটেল থেকে আমরা বেরুচ্ছি না। অলকের সঙ্গে দেখা হলে পর কালকের কথা ভাবা যাবে।

—কাজটা কালকেই করলে হয় না?

সোহনলাল নীচের দিকে তাকাল। একটু পরে গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, আমিও তাই ভাবছি। দেখা যাক, অলকের রিপোর্টটা আগে শুনি।

পৃথ্বিরাজের চোখ দুটো চকচক করে উঠল। —কোই পরোয়া নেই ইয়ার। সেরকম বুঝলে কলকাতায় গিয়ে লুসিকেও হালাল করে ছাড়ব। কিন্তু গোল্ডীকে খুন করে যেতেই হবে। ওতে উনিশ-বিশ হবে না। সোহনলালকে দরজার দিকে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করল—কোথায় যাচ্ছিস?

—বারান্দা থেকে হোটেল রেক্সের ওপর নজর রাখতে হবে। তুই গ্রীনভ্যালীর দিকে খেয়াল রাখিস। বলে সোহনলাল বেরিয়ে গেল।

সেদিন রাত নটা পর্যন্ত যখন অলকের সংকেত এল না সোহনলালকেই ওর বাংলোর দিকে টর্চের আলো ছুঁড়তে হল।

উত্তরটা এল কিছুক্ষণ পর। অলকের আলো তিনবার জ্বলে নিভে যেতেই সোহনলাল তৎপর হয়ে উঠল। পৃথ্বিরাজ তখন বারান্দায় বসে হোটেল রেক্সের ওপর নজর রাখছে। এতক্ষণ ওরা পালা করে হোটেলটার ওপর নজর রাখছিল। অবশ্য সেই দুপুর থেকে এখন অবধি লুসি বা লুসির সঙ্গীকে ওরা কেউ হোটেলের বাইরে বেরোতে দেখল না। সোহনলাল চাঁদমারী পোলে যাবার জন্য পৃথ্বিরাজকে এবার বারান্দা থেকে উঠিয়ে

আনল। সোওয়া নটা নাগাদ ওরা পোলের দিকে রওনা হয়ে গেল।

জঙ্গলের ভেতর অন্ধকারে চাঁদমারীর পোলের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল ওরা। একটু দূরে সিগারেটের একটা জ্বলন্ত বিন্দুর দিকে তাক্ করে সোহনলাল ওর টর্চ জ্বালাল। ওপারেও একটা জ্বলে উঠল। তারপর ওরা এগিয়ে গেল।

—কি হল, আজ ভেবেছিলাম তোর সিগন্যালিং পাব। সোহনলাল অলকের ছায়ামূর্তির মুখোমুখি এসে কথাটা বলল।

—পেতে, আর একটু রাত হলে পর। অলকের জবাব এল। তার আগেই তোমরা করলে, ব্যাপার কি ?

—ব্যাপার ?—থামল সোহনলাল। চারপাশের অন্ধকারকে একবার আঁচ করে নিল। পোলের ভাঙ্গা চত্বরটার ওপর টর্চের একটা ফ্ল্যাশ মেরে ওটায় ভাল করে বসল। বলছি, তার আগে তোর খবর বল। এদিক সব ঠিক ত ?

অলকের ছায়াটা একটুর জন্য নিথর হয়ে গেল। ওর জবাব শোনার জন্য পৃথ্বিরাজ তখন পোলের মাথায় দাঁড়িয়ে উসখুস করছে।

—হ্যাঁ, সব ঠিক। সোহনলালের দিকে এগিয়ে দাঁড়াল অলক।

—দীপকের সঙ্গে গোল্ডীর মোলাকাতের আজ পাঁচদিন।

—পাঁচদিন! তার মানে এসেই গোল্ডী কেল্লা ফতে করেছে। সাবাস্। সোহনলালের স্বর যেন নেচে উঠল।

পৃথ্বিরাজ এগিয়ে এল ওদের কাছে। সিমেন্টের চত্বরের ওপর ডান পা-টা তুলে ওদের কথাবার্তা শোনার জন্য ঝুঁকে দাঁড়াল।

অলক নীচু হয়ে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে আস্তে বলল—হ্যাঁ, সবকিছু এখন পর্যন্ত ঠিক ঠিক এগিয়ে চলছে। শুধু রাস্তার একটা ঝামেলা ছাড়া।

—কেন, কি হয়েছিল ? সোহনলাল চমকে উঠল।

—গোল্ডীর গাড়ি নৈনীতালে একটা একসিডেন্ট করেছে।

—একসিডেন্ট, কার সঙ্গে ?

—একটা অ্যামবাসাডার। তবে গোল্ডীর গাড়ির ক্ষতি হয়েছিল বেশী।

তারপর অলক সবিস্তারে নৈনীতালের ঘটনাটা বলল।

সব শুনে সোহনলালের গলায় চিন্তার সুর ফুটে উঠল।—তাহলে ছ-ঘণ্টা নৈনীতালে গোল্ডীর সঙ্গে থাকতে হয়েছে তোকে।

—হ্যাঁ, তবে যেখানে আমরা ছিলাম সে জায়গাটা নির্জন। লোকাল লোক খুব কমই দেখেছে আমাদের। কয়েকজন ট্যুরিস্ট ছাড়া।

—তবু রানীক্ষেতের কাছাকাছি এসে এভাবে একসঙ্গে থেকে ভাল করিস্ নি।

—উপায় ছিল না। অলক গম্ভীর হল—গোল্ডী তখন ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছিল।

পৃথ্বিরাজ পা নামিয়ে অস্থির হয়ে উঠল। অলক একটা সিগারেট ধরাল। দেশলাইয়ের আলোয় ওর মুখটা ভালকরে দেখতে পেল সোহনলাল। নিখুঁত ছদ্মবেশে ওকে এত কাছ থেকেও চেনা গেল না।

সিগারেট মুখ থেকে নামিয়ে অলক এবার বলল—সে নিয়ে ভেব না সোহনলাল। যারা আমাকে ওখানে দেখেছে তারা আমাকে মনে রাখবে না। আমরা এগোতে পারি।

—তাহলে কাজটা কবে করতে চাস্?

—কেন, কাল। কিন্তু তোমরা কি যেন বলছিলে—তোমাদের কি খবর?

—আমাদের খবর আরো সাংঘাতিক। লুসি রানীক্ষেতে এসেছে।

—লুসি! অলকের গলা যেন বন্ধ হয়ে এল। ফেলিক্সের মেয়ে লুসি?

—হ্যাঁ, আজকেই এসেছে, ওর এক সঙ্গীর সঙ্গে। আমাদের হোটেলের সামনে রেক্স-এ উঠেছে ওরা।

—লুসি রানীক্ষেতে! অলক প্রায় দম বন্ধ করে বলল—কিন্তু ওর আসার কারণ? জানতে পেরেছ কিছু?

—এখন পর্যন্ত নয়। ওর হোটেলের ওপর নজর রেখেছিলাম। কিন্তু রাত ন'টা অবধি ওদের কাউকে বেরোতে দেখিনি। মনে হচ্ছে মজা লুটতেই এসেছে। কারণ ওর সঙ্গীটিকে দেখে মনে হল মালদার পার্টি।

—আর কিছু হতে পারে কিনা ভেবে দেখেছ?

—হলে পর ও লুকিয়ে আসত। এভাবে খোলাখুলি আসত কি?

তাছাড়া লুসি এর মধ্যে আসবে কি করে ?

হুঃ, তা ঠিক। অলক ভাবল মনে মনে। ওদের এই ব্যাপারের সঙ্গে লুসির কি সম্পর্ক থাকতে পারে ? তবু কলকাতার ফ্ল্যাটে সেই শাসানির কথা মনে পড়ে গেল ওর। সে রাতে ছুঁড়ি খুব বে-ইজ্জত হয়ে ফিরেছিল ওর ফ্ল্যাট থেকে। এক হয়, সেজন্যই ও যদি অলকের এই কাজের কোন আঁচ পেয়ে প্রতিহিংসায় বাগড়া দিতে আসে। কিন্তু তার কোন সম্ভাবনা নেই। লুসি কেন, ওদের দলেও ওরা চারজন ছাড়া এ বিষয়ে আর কেউ কিছুই জানে না।

অলক সোহনলালের পাশে এসে বসল। —কালকের দিনটাই আমি ঠিক করে রেখেছিলাম। তাহলে কি লুসি চলে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হবে ?

—না, সোহনলাল গম্ভীর স্বরে বলল। কাল-ই সব সেরে ফেলব। লুসির চোখ বাঁচিয়ে একটা দিন থাকতে খুব অসুবিধে হবে না। কাজটা কোথায় হবে ?

—গোল্ডীর বাংলোয়।

—দীপকের বাংলোতে—?

—অসুবিধে আছে, চাকর-বাকর প্রচুর। এ বাংলোতে একটা বাবুর্চি আর মেড-সার্ভেন্ট শুধু ভেতরে থাকে। কাজটা এখানে সহজে হবে।

—পৃথ্বিরাজ ঢুকবে কি করে ?

—পেছন দিয়ে ভাল রাস্তা আছে। ওকে বাথরুমেই থাকতে হবে। সেসব আমি কাল দেখিয়ে দেব। তার আগে গোল্ডীকে ফোন করে দীপককে ডিনারে নেমন্তন্ন করার কথাটা বলে নিতে হবে।

—আচ্ছা, কালকে আবার দেখা করতে হচ্ছে আমাদের ?

—হ্যাঁ, মুশকিলটা হল সেখানে। অলক ভাবতে ভাবতে বলল, আজ আমি ফোনটা করেই তোমাদের সঙ্গে দেখা করব ভেবেছিলাম। গোল্ডীর সঙ্গে কথা না বলে ছকটা পুরোপুরি ঠিক করতে পারছি না। কিন্তু কালকেই কাজটা করতে হলে আমরা দেখা করব কখন ?

—ডিনারের একঘণ্টা আগে দেখা করলেই হবে। সোহনলাল

সিদ্ধান্তের সুর নিয়ে বলল, তাছাড়া আর উপায় নেই।

—ঠিক আছে, তাই হবে। আমি সব ঠিক করে ফোকাসিংটা করব। কিন্তু আমাদের রানীক্ষেত ছাড়বার ব্যবস্থা কিছু করেছ?

—হ্যাঁ, কাজটা করার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা জীপে করে পালাতে পারব। সোহনলাল উঠে দাঁড়াল।

ওরাও উঠল। তারপর ওরা পোল থেকে নামতে লাগল। সোহনলাল অলককে লুসির জন্য রানীক্ষেতে চলাফেরায় সাবধান করে দিল।

নৈনীতাল হাইওয়ের ওপর এসে ওরা আলাদা হয়ে গেল। পৃথ্বিরাজ ও সোহনলাল পা চালিয়ে ম্যালের দিকে এগিয়ে গেল। অলক একটু পেছিয়ে থাকল। সহরের দিকে ওরা একসঙ্গে চলতে চাইছিল না।

হাইওয়েটা এদিকে ফাঁকা। অন্ধকারে বলতে গেলে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। অলক ধীরে ধীরে রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটছিল। সোহনলাল আর পৃথ্বিরাজ নিমেষের মধ্যে ওর চোখের আড়ালে চলে গেল।

চারদিকে নিস্তব্ধ নির্জন পরিবেশ। হাটতে হাঁটতে হঠাৎ অলকের মনে হল মনটা কেন যেন ভারী ভারী লাগছে। সঙ্গে সঙ্গে ও নিজেকে সামলে নিল। ভাল না লাগার কারণটাকে মন থেকে খুঁচিয়ে বার করতে চাইল না।

অলক পা চালাল। বাংলোতে গিয়ে গোল্ডীকে তাড়াতাড়ি ফোনটা করতে হবে। আর একটু এগিয়ে বাঁ-দিকে গ্রীনভ্যালীর বাংলোগুলোর পেছন দিয়ে একটা মেঠো পথ পাওয়া যাবে। ওর বাংলোর দিকে যাওয়ার শর্টকাট ওটা। অলকের পেছনে অনেকদূর থেকে একটা গাড়ি আসার মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওটা কাছে এসে পড়ার আগেই মেঠো পথটা ওকে ধরতে হবে। তাই ও একটু দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ থেকে হাওয়াটা বেশ জোর বইতে শুরু করেছে। তার মধ্যে বৃষ্টির কয়েকটা ঝিরঝিরে ফোঁটাও পড়ছে। ঠাণ্ডাটা তাই দ্বিগুন হয়ে উঠেছে। ওভার-কোটের কলার-টা পেছন দিকে তুলে কালকের চিন্তা মাথায় নিয়ে ও হাঁটতে থাকল।

কিন্তু সামনের মোড়টা পেরোনোর আগেই মনে হল পেছনের গাড়িটা খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। দূরে দু-তিনটে গাছের পাতায় হেড-লাইটের আলো ঝিকমিক করে উঠতেই অলক সতর্ক হয়ে উঠল। ঐ আলোর মধ্যে ও পড়তে চাইছিল না। সামনে মোটা গুড়িওয়ালা একটা গাছ দেখে ও চট্ করে তার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

গাড়ির গমগম আওয়াজের সঙ্গে একঝলক আলো এসে পড়ল গাছটার ওপর। গাড়িটা মোড়ের কাছে বাঁক নিয়ে রানীক্ষেতের সোজা রাস্তায় ছুটতে থাকল। অলক এবার বেরিয়ে এল গাছের আড়াল থেকে। গাড়ির তীব্র আলো হাইওয়ের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ ও থমকে গেল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না অলক। লাইটের আলোয় দেখল, গ্রীনভ্যালীর সেই মেঠো পথের মুখে লুসি দাঁড়িয়ে।

লুসি একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গ্রীনভ্যালী রোডের প্রথম বাংলোটার দিকে তাকিয়েছিল। গাড়িটার আলো ওর ওপর পড়তেই ও চমকে উঠল। অলকের পা আর চলল না। স্তম্ভিত চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তখনই।

সম্পূর্ণ জায়গাটাকে অন্ধকারে ফেলে গাড়িটা চলে যাবার পর লুসির শুধু আবছা ছায়াটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অলক বুঝতে পারল না লুসির এখানে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ কি? এই অন্ধকারে ঐ বাংলোটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কি দেখছে ও? সোহনলালদেরও কি দেখতে পেয়েছে? ওরা ত একটু আগেই এখান দিয়ে গেছে। অলকের শিরদাঁড়া হিম হয়ে গেল।

এর মধ্যে হঠাৎ লুসির ছায়াটা নড়ে উঠল। আবছা অন্ধকারে দেখল অলক, লুসি জোর কদমে ম্যালের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। ভারী পায়ে অলকও কয়েক পা এগিয়ে গেল। লুসিকে অনুসরণ করবে কি করবে না ভাবতে না ভাবতেই হঠাৎ দুটো ছায়া হাইওয়ের পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল।

অলক সতর্ক হয়ে হিপ পকেটে হাত রাখল। আর ঠিক তখনই চাপা

একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। —দাঁড়া অলক।

ওরা সোহনলাল ও পৃথ্বিরাজ।

—কি দেখলি? সোহনলাল ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল।

—লুসি। রুদ্ধ কণ্ঠে বলল অলক। কিন্তু ব্যাপার কি সোহনলাল?

সোহনলাল জবাব দেবার আগেই পৃথ্বিরাজ বলে উঠল—বসে পড়্ বে, আরেকটা আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ওরা অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে পড়ল।

ওরা দেখল গ্রীনভ্যালী রোডের প্রথম বাংলোটার পেছনের গেট দিয়ে একটা লোক বেরিয়ে আসছে। লোকটা মেঠো পথ পেরিয়ে নৈনীতাল হাইওয়ের ওপর এসে পড়ল। তারপর ম্যালের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

ওদিকে অন্ধকারে তখন লুসি হাওয়া। তিনজন উঠে দাঁড়াল।

—খোমাটা চিনতে পেরেছিস?

—কে বল ত? পৃথ্বিরাজের গলা শুনে দুজনেই প্রশ্ন করে উঠল।

—লুসির সেই নাগর।

অলক ও সোহনলাল নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। সোহনলাল জিজ্ঞেস করল—এই বাংলোটা কি খালি নয়, অলক?

—খালি বলেই জানি। ডিকিও বলেছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে গণ্ডগোল কিছু থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু তাহলেও লুসি এর মধ্যে কি করে আসবে?

অন্ধকারে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ পর সোহনলাল বলল—সেটা আমারও প্রশ্ন। যাই হোক, এ অবস্থায় কালকের কাজ আমাদের মুলতুবি রাখতে হবে।

গম্ভীর মুখে অলক মাথা নেড়ে সায় দিল—ঠিক আছে, আমি কালকের মধ্যে বাংলোটার খবর নিয়ে নেব।

—তাহলে আমরা একটা কাজ করি। আজ থেকে কাল সন্ধ্যে অবধি পৃথ্বিরাজ আর আমি লুসির ওপর নজর রাখছি। কাল সন্ধ্যে সাতটার সময় আমাদের যেমন দেখা হওয়ার কথা ছিল তাই হবে। তারপর দুদিকের রিপোর্ট পেয়ে সব ঠিক করা যাবে।

পৃথ্বিরাজ ও সোহনলাল সেখানে আর দাঁড়াল না। ওরা লুসি ও তার

সঙ্গীর জন্য দ্রুত পায়ে ম্যালের দিকে এগিয়ে গেল।

অলক মেঠো পথে ঢোকার মোড়টাতে এসে সেই বাংলোর পেছনে একটা ঝোপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। যা দেখার ওকে এখনই দেখে রাখতে হবে।

বাংলোটা অন্ধকারে থমথমে ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একমাত্র সার্ভেন্টস কোয়ার্টারগুলোর একটা ঘরে আলো জ্বলছে। ঐ ঘরটায় চৌকিদার থাকে। চৌকিদারকে চেনে অলক। এই মেঠো পথ দিয়ে আসা যাওয়া করতে গিয়ে ওর সঙ্গে দু-একবার দেখা হয়েছে। এই ঠাণ্ডায় চৌকিদারটা ভেতর থেকে বেরোবে না নিশ্চয়ই। অলক রাস্তার দু-পাশে ভাল করে তাকিয়ে গেটের ভেতর ঢুকে পড়ল।

পুরো বাংলোটা চক্কর দিয়ে ঘুরে দেখতে কুড়ি মিনিটের মত লাগল ওর। প্রত্যেকটা দরজা হাতড়ে দেখল। জানলাগুলোতে কান পেতে ভেতরের সব কিছু আঁচ করার চেষ্টা করল। কিন্তু সন্দেহের কিছুই পাওয়া গেল না। দরজা জানলা সব বন্ধ। সামনের দরজায় মস্ত বড় তালাও ঝুলছে। অলক যেভাবে ঢুকেছিল সেভাবেই আবার বাংলো থেকে বেরিয়ে এল।

অশান্ত মন নিয়ে নিজের বাংলোয় ফিরে এল অলক। লুসি ওর কাছে এখন সত্যি একটা হেঁয়ালী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এত রাতে গ্রীনভ্যালী রোড পর্যন্ত সঙ্গীর সাথে ওর এই রহস্যময় আগমনের পর রানীক্ষেতে ওর এ সময়ে হাজির হওয়াটাকে আর অন্য ভাবে ভাবতে পারল না অলক। তবু এর উদ্দেশ্যটা ওর কাছে রহস্যই রয়ে গেল। লুসির মত শুঁড়িখানার একটা মেয়ে যার সঙ্গে ওদের দলের কেন, কোন দলেরই সম্পর্ক নেই, সে অলকদের এই কাজের ভেতর কি করে আসতে পারে ও বুঝতে পারল না। তাহলে কি ওর আশঙ্কাটাই সত্যি? সব কিছুর মূলে কলকাতার সেই ঘটনাটা? এমন কি হতে পারে সে ঘটনার পর লুসি ওর পেছনে লোক লাগিয়ে গোষ্ঠীর সঙ্গে ওর যোগাযোগের কোন আঁচ পেয়েছে? আর তারই সূত্র ধরে ওর এই রানীক্ষেতে আসা? ভাবতে ভাবতে অলক চমকে উঠল। তাই যদি হয় তাহলে এখনি ওদের সাবধান হয়ে যেতে হবে।

রাতের খাবার খেতে বসে অলক ভাবল এর পর কি করা উচিত। লুসি ও তার সঙ্গীর ওপর সোহনলালরা অবশ্য কড়া নজর রাখবে। কিন্তু এদিকে খালি বাংলোটার রহস্যও জানা দরকার। লুসির সঙ্গী যখন ওর ভেতরে ঢুঁ মেরেছে তখন লুকনো কোন ব্যাপার ওখানে আছে নিশ্চয়ই। অন্ধকারে শুধু বাংলোর চারপাশ ঘুরে অলক সন্তুষ্ট হতে পারে নি।

ওর গাড়োয়ালী বাবুর্চি-কাম-বেয়ারা ধেয়ান সিং তখন খাবার পরিবেশনে ব্যস্ত। লোকটি চালাক-চতুর। এ কদিনে অলকের বিশ্বাস ভাজন হতে পেরেছে। খেতে খেতে হঠাৎ ওকে জিজ্ঞেস করল অলক— একটা খালি বাংলোর খোঁজ দিতে পারবি? রানীক্ষেতে আমার এক দোস্ত আসছে।

—উ ত খুঁজতে হবে হুজুর। গ্লাশে জল ঢালতে ঢালতে ধেয়ান সিং জবাব দিল।—তবে সিজিন মে বাংলো মিলা মুশকিল আছে।

—কেন, সামনের ঐ ডান দিকের বাংলোটা? অলক আড় চোখে তাকাল, দরজা জানলা সব সময় বন্ধ থাকে দেখেছি।

—বড়া রাস্তার পাশেরটা বলছেন? না হুজুর, ওটা খালি হলেও ভাড়া হয়ে গেছে। লোক আসবে।

—লোক আসেনি তুই ঠিক জানিস?

—হাঁ, এখানকার সব বাংলোর খবর আমরা রাখি। ওটা পাওয়া যাবে না। আমি আপনার জন্য অন্য বাংলো দেখব।

ধেয়ান সিং-এর নির্লিপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে এর বেশী জিজ্ঞেস করল না অলক। বাকী রাতটুকু বাংলোটার ওপর ভাল করে নজর রেখে কাল সকালে যা করার করবে এই ভেবে খাওয়া সেরে উঠে পড়ল।

তার ঠিক পনের মিনিট পরের কথা।

অলক তখন ওর শোবার ঘরের আলো নিভিয়ে ডান দিকের একটা চেয়ারে বসে আছে। জানলার পর্দাটা একটু উঁচুতে ওঠানো। সিগারেট খেতে খেতে ও খালি বাংলোটার দিকে তাকিয়ে ছিল।

কিছু যে ওর নজরে পড়বেই এমন কোন আশা নিয়ে ও বসে ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা ব্যাপার নজরে পড়ল। হঠাৎ লক্ষ্য করল, একটা

লোক বাংলোটার গেট দিয়ে বেরিয়ে মেঠো পথে এদিকেই হেঁটে আসছে।

হাতের সিগারেট নিভিয়ে অলক উঠে দাঁড়াল। এতদূর থেকে লোকটার শুধু ছায়ামূর্তিটা দেখা যাচ্ছিল। দীপকের বাংলোর বাতিটার কাছে আসতেই ওকে চিনতে পারল অলক। লোকটা মোহন সিং। খালি বাংলোর চৌকিদার। কিন্তু এত রাতে ও যাচ্ছে কোথায়? ওকে কি অনুসরণ করবে অলক? ভাবতে না ভাবতেই ও অবাক হয়ে দেখল মোহন সিং মেঠো পথ থেকে সিঁড়ি দিয়ে ওদের বাংলোতেই উঠে আসছে। শক্ত টান হয়ে অলক ঘরের আরো ভেতরে পেছিয়ে এল।

মোহন সিং জানলার পাশ দিয়ে বাংলোর পেছন দিকে চলে গেল।

একটু অপেক্ষা করে অলক শোবার ঘর থেকে পা টিপে টিপে ড্রয়িং রুমে ঢুকল। লোকটা যে ওর বেয়ারার কাছেই এসেছে সেটা বুঝতে ওর বাকী রইল না। এই বাংলোতে সার্ভেন্ট কোয়ার্টার নেই। ধেয়ান সিং কিচেনেই ঘুমোয়। অলক নিঃশব্দ পায়ে ড্রয়িং রুমের পেছন দরজা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—ধেয়ান সিং ও ধেয়ান সিং।

—কে? আরে মোহন, কিরে।

—শুচ্ছিস বুঝি? ছিলিমটা বার কর। আমার শালা মাল খতম। তোরটাই টানতে এলাম তাই।

—আয় আয় বোস।

—হাঁ, বসবো ত বটে। ছিলিম না ফুঁকে নিদ আসছে না যা-ও শালা একটু টেনে ছিলাম এক সাহেব এসে মাটি করে দিয়ে গেল।

—কেন, কি হল?

—আর বলিস না, খালি বাংলোর চৌকিদারী করা কি ঝক্কির কাজ! রোজই ওটা ভাড়া নিতে লোক আসে। সবাইকে বলতে হয় ভাড়া হয়ে গেছে। আজ ত এক পুরনো সাহেব আমার খুপরী অবধি ধাওয়া করেছিল।

—কোন্ সাহেব রে?

—তুই কি চিনিস্, ঐ যে হর সাল যে একটা করে নতুন চিড়িয়া বগলে

নিয়ে আসে।

—আমি আর চিনব কি করে? আমার ত এখানে নতুন চাকরী। তবে গিরিন ভ্যালিতে বাংলো খালি রয়েছে, লোক ত আসবেই। আমার বাবুও বলছিল।

দরজার ওপার থেকে ঐটুকু শুনেই অলক অনেক হালকা পায়ে ও কামরায় ফিরে এল। লুসী সম্পর্কে সন্দেহের মেঘটা এবার কাটল ওর মন থেকে। নিশ্চিন্ত মনে ভাবল অলক, তাহলে এই ব্যাপার? সত্যি-ই লুসী মৌজ করতে এসেছে এখানে? ঐ সঙ্গীটি তাহলে এদের চেনা। তার মানে রানীক্ষেতে অলকদের সঙ্গে ওর দেখা হওয়াটা নিতান্ত যোগাযোগের ব্যাপার।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল অলক। সাড়ে এগারটা বেজে গেছে। রানীক্ষেতে এটাই অনেক রাত। এবার ওকে শুতে হবে। বাংলোটা সম্বন্ধে ও মোটামুটি নিশ্চিন্ত হতে পারলেও সোহনলালরা বোধ হয় এখনো লুসীর হোটেলটার দিকে তাক্ করে আছে। আগামীকাল ওদের রিপোর্ট‌ও পাওয়া যাবে। তারপর লুসীর ব্যাপারে ভাল করে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারবে ওরা।

অলক শোবার আগে ডানদিকের জানলার ওঠানো পর্দাটা নামাতে গেল। তখনি গোল্ডীর বাংলোর দিকে নজর পড়ল ওর। গোল্ডীর বেড রুমে নাইট-বাল্বটা জ্বলছে। সেই আবছা আলোয় গোল্ডী জানলার গ্রীলের ওপর হাত রেখে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

অলক দৃষ্টি ফিরিয়ে চট করে পর্দাটা নামিয়ে দিল।

পরের দিন সন্ধ্যে সাতটার সময় ওরা যখন আবার সেই চাঁদমারীর পোলে এসে হাজির হল তখন সারা রানীক্ষেত জুড়ে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। তিনজনের মধ্যে সোহনলাল ও পৃথ্বিরাজের মাথায় ছাতা, অলকের পরনে একটা বর্ষাতি।

সোহনলাল ও অলক তারপর পরস্পরের কাছ থেকে লুসী সম্বন্ধে য রিপোর্ট পেল তাতে ওদের কারোরই মেয়েটার ওপর কোন সন্দেহ রইল

না। লুসী ও তার সঙ্গী নাকি গত রাত থেকে আজ সন্ধ্যে পর্যন্ত দুবার মাত্র হোটেল থেকে বেরিয়েছে। সে দু-বারই সোহনলাল ও পৃথ্বিরাজ ওদের রানীক্ষেতে শুধু বাংলো খুঁজে বেড়াতে দেখেছে। অলকও খালি বাংলোটার সম্বন্ধে ওর নিজের অভিজ্ঞতা আর আড়ি পেতে শোনা চৌকিদারের কথাগুলো ওদের বলল।

সব শুনে সোহনলাল বেশ সহজ গলায় বলল—তাহলে আর কি, লুসীকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই দেখছি।

—হুঁ, একমাত্র ওর চোখ বাঁচিয়ে ঢলাফেরা করা ছাড়া। অলকও মাথা দোলাল।—অবশ্য কালই এখানে আমাদের শেষ দিন। গোল্ডী দীপকের সঙ্গে আজ গাড়ি করে কোথাও বেড়াতে গেছে। ফিরে এলেই ওকে আমি কালকের ডিনারের ব্যবস্থা করার জন্য ফোন করব।

—ঠিক আছে। কাজের ছকটা তাহলে ভেবে রেখেছিস?

—হ্যাঁ, সামনের চত্বরের ওপর ডান পা-টা তুলে অলক জবাব দিল। খুনটা হবে পৃথ্বিরাজ, গোল্ডীর বাথরুমে ঢোকার ঠিক আধঘণ্টা পরে। সময়টা আমি ও পৃথ্বিরাজ ঠিক করে নেব।

—কেন, একটা সময় ত আমরা এখনি ঠিক করে নিতে পারি। ডিনারে গোল্ডী দীপককে কখন আসতে বলবে সেটা কি ঠিক করা যায় না?

—ওকে ফোনটা না করে বলতে পারছি না। তবে দীপক কাল গোল্ডীর বাংলোয় যখনই আসুক, আমি আর পৃথ্বিরাজ সেটা বাইরে থেকে লক্ষ্য করতে পারব। ওর হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথ্বিরাজ ঢুকে পড়বে।

—কিন্তু ও বাথরুমে ঢুকবে কি করে সেটা তুই এখনো বললি না।

জবাবটা অলক একটু পরে দিল। ভাবতে ভাবতে বলল—গোল্ডী-ই বাথরুমের দরজা খুলে রাখবে। ফোনটা করলে সব ঠিক হয়ে যাবে, ও নিয়ে ভেব না।

—বেশ, তারপর?

—পৃথ্বিরাজ বাথরুমে ঢোকার আধঘণ্টা পরে ম্যাল থেকে গোল্ডীকে আমি একটা ফোন করব। ওর ফোনটা বেডরুমে আছে। ফোন অ্যাটেণ্ড

করতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথ্বিরাজকে কাজ সেরে নিতে হবে।

মন দিয়ে সব শুনল সোহনলাল। একটু আশঙ্কার সুরে জিজ্ঞেস করল, কিন্তু দীপক আর গোল্ডী যদি তখন বেডরুমেই হাজির থাকে?

—না বেডরুমে বসে গোল্ডী দীপকের সঙ্গে গল্প করবে না। অলকের স্বর নিশ্চিত শোনাল।—ওরা ড্রয়িংরুমেই থাকবে। ভাল কথা, তোমাদের কাছে ডিকির দেওয়া গোল্ডীর বাংলোর ছকটা আছে ত?

—হ্যাঁ এতক্ষণ পর নিঃশব্দ পৃথ্বিরাজ ওর ভরাট গলাটা ছাড়ল—ও ছক আমার ছানা হয়ে গেছে। বাথরুমটা যে বেডরুমের লাগোয়া, জানি।

—ঠিক আছে, এই প্ল্যানটাই থাক্। সোহনলাল এবার সিদ্ধান্তের রেশ টানল—কাল কখন দেখা হচ্ছে?

—জীপটা রাখবে কোথায়? পাল্টা প্রশ্ন করল অলক।

—বেহড়ের জঙ্গলে, সোহনলাল নৈনীতাল হাইওয়ের উত্তর দিকে হাত দেখাল। —চাঁদমারীর এই জঙ্গলের ওপারে যে উঁচু পাহাড়টা আছে তার আড়ালে থাকবে।

—বুঝেছি, তার মানে বড় খাদটার পাশে। অলক মাথা ঝাঁকাল।—তাহলে কাল সাড়ে ছটার সময় তোমাদের হোটেল থেকে বেরুলেই চলবে। তোমার এদিকে আসার দরকার নেই। তুমি বেহড়ের জঙ্গলে জীপের মধ্যেই থেকে যেও। শুধু পৃথ্বিরাজ এই পোলের ওপর আসবে। আমরা দুজন পৌনে সাতটার মধ্যেই গোল্ডীর বাংলোর দিকে চলে যাব।

—তার মানে ম্যাল থেকে ফোনটা করেই তুই জীপে চলে আসছিস্।

—হ্যাঁ, পৃথ্বিরাজও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চলে আসতে পারবে।

রাত সাড়ে ন-টা নাগাদ ফোনটা করল অলক। গোল্ডী তার একটু আগে বাংলোতে ফিরেছে। অলক ওকে দেখেই ম্যালের একটা দোকানে খুব সতর্ক হয়ে চলে এসেছিল।

—আমি তাপস মুখার্জী বলছি।

—মিঃ মুখার্জী। গোল্ডী ওপাশ থেকে এমন ভাবে বলে উঠল যেন বহুদিন বোবা হয়ে থাকার পর এই প্রথম কথা বলল।

—অভিনন্দন, চাপা কণ্ঠস্বরে বলল অলক, এত কম সময়ে এতদূর এগোবেন ভাবতে পারি নি। আপনার কাজ ত প্রায় শেষ হয়ে এল।

—তাই নাকি, তাহলে আর ক'দিন ?

—আপাতত আপনার আর একটাই কাজ বাকী।

—বলুন।

—কাল ওকে বাংলোয় ডিনারে নিমন্ত্রণ করতে হবে।

—ডিনার···বেশ, করব। তার পরেই কি আমার ছুটি ?

—ছুটি মানে, একটু ইতস্ততঃ ভাব দেখাল অলক। তার আগে ওকে আমি একবার ভাল করে দেখে নিতে চাই।

—কেন ? রোজই ত দেখছেন।

—সেটা দূর থেকে। ওতে ঠিক বোঝা যায় না। আপনার এ কদিনের সঙ্গ ছেলেটাকে কি রকম স্বাভাবিক করল সেটা কাছ থেকে না দেখলে বোঝা যাবে না।

—বুঝেছি, তাহলে কি ভাবে দেখবেন ?

—ডিনারের সময় ওর অজান্তে আপনার বাংলোয় যদি ঢুকি ?

—বেশ। খুব ভাল হয় আসুন না।

—ঠিক আছে, তাহলে একটা কাজ করলেই হবে, কাল সন্ধ্যের আগে আপনার বাথরুমের দরজাটা খুলে রাখবেন। এক ফাঁকে যখন সময় পাব আমি ঐ দরজা দিয়ে বাংলোয় ঢুকে সব দেখে আসব।

—ঠিক আছে। সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল গোল্ডী, তাই হবে।

—তাহলে দীপককে কখন আসতে বলছেন ?

—সন্ধ্যে সাতটায় ?

—গুড্ রেখে দিচ্ছি।

গোল্ডীর বোধ হয় আরো কথা বলার ইচ্ছে ছিল। সেটা আঁচ করেই অলক চট করে রিসিভার নামিয়ে রাখল।

গোল্ডীকে ফোনটা করে বাংলোর দিকে ফিরে আসছিল অলক। গোল্ডী-খুনের বন্দোবস্ত ঐ ফোনের পরই পাকাপাকি ভাবে শেষ হল। বলতে

গেলে ডিকির এ কাজে অলকের দায়িত্বটুকুরও ইতি হল সেই সঙ্গে। এর পর যা কাজ পৃথ্বিরাজের।

অলক সে কথাই ভাবতে ভাবতে বৃষ্টির মধ্যে হাঁটছিল।

হঠাৎ ওর মনে হল ফোনে গোল্ডীর সঙ্গে কথা বলার পর থেকে ও যেন কি রকম আনমনা হয়ে পড়ছে। ঠিক তখন থেকে মনের ভেতর একটা ভাবনা উপরে ওঠতে চাইছে। নিজেই ও তা বার বার চেপে রাখার চেষ্টা করছে।

চারদিকে তাকাল অলক। আজ রানীক্ষেত আরো গম্ভীর আরো নির্জন মনে হল ওর। এ কদিন এমনিতেই ও একা ছিল। কিন্তু আজ যেন সেই একাকীত্ব আরো বেশি করে মনে হচ্ছে।

বাংলোর কাছাকাছি আসতেই আনমনা ভাবটা কাটাতে হল ওকে। দূরে পিক-এন-ভিউ-এর দিকে নজর পড়ল। দোতলার বাঁ দিকের জানলায় দুটো ছায়া এ দিকে মুখ করে দাঁড়ান। অর্থাৎ অলকের সিগন্যালিংয়েব অপেক্ষায় ওরা। গোল্ডীর সঙ্গে ডিনারের কথা ঠিক হল কিনা সেটাই জানতে চায়। অলক এবার জোরে পা চালাল।

কিন্তু নিজের বাংলো আর গোল্ডীর বাংলোর মাঝামাঝি জায়গায় আসতেই পায়ের গতি হঠাৎ কমে গেল ওর। গোল্ডী ওর বেডরুমের জানলায় রোজ রাতের মত দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে উঠতে পারল না অলক। কেন যেন থেমে গেল। বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে জানলার ছায়াটার দিকে তাকাল। তারপর সবকিছু ভুলে একদৃষ্টে তাকিয়েই থাকল। গোল্ডীর দৃষ্টিও এইদিকে।

দুটো ছায়াই কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চল হয়ে রইল।

একটু পরে জোর করে সম্বিত ফিরিয়ে আনল অলক। বাংলোয় ঢুকে ড্রয়িং-রুমে দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আর চব্বিশ ঘণ্টাও বাকী নেই। কাল এতক্ষণে সব শেষ হয়ে যাবে। কথাটা ভাবতেই ও চমকে উঠল। হাতের মুঠো শক্ত করে নিজেকে জিজ্ঞেস করল, এসব অবান্তর কথা ভাবছে কেন ও? কি হল ওর হঠাৎ। বুকের ভেতর এ রকম মোচড় দিয়ে উঠার কারণ?

না, না, আর গোল্ডীকে নিয়ে ভাববে না অলক। এ চিন্তা বড় বিপজ্জনক। নৈনীতালের সেই অদ্ভুত অনুভূতির কথা আর ওকে নিয়ে একটু ভাবতে গিয়ে যে ভালো লাগার শিহরণ পেয়েছে ও—সব কিছু ভুলে যেতে হবে। কলকাতার এক নম্বর আণ্ডারগ্রাউণ্ড রিং লিডার ডিকির ডান হাতের পক্ষে এ সব ভাবনা মানায় না।

অলক টর্চের জন্য বেডরুমের দিকে পা বাড়াল। গোল্ডী ওর বাংলোর জানলায় দাঁড়িয়েছিল বলেই ওকে নিজের বাংলোর একেবারে পেছন ধারে চলে যেতে হল। সেখান থেকেই ফোকাসিং করে ও সোহনলাল আর পৃথ্বিরাজকে জানিয়ে দিল সব ঠিক আছে। ফোকাসিংটা পেয়েই ছায়া দুটো জানলা থেকে সরে গেল। নিজের বেডরুমে ফিরে অলক সামনের জানলার দিকে আর গেল না। কারণ ও জানে গোল্ডী তখনো ওর জানলায় দাঁড়িয়ে। জামাকাপড় ছেড়ে ও তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল।

রাত দশটা বাজল। এগারটা বাজল।

ঘড়ির কাঁটা তখন বারটার কাছাকাছি। কিন্তু অলকের ঘুম এল না। এতক্ষণ ধরে ও বিছানায় এপাশ ওপাশ করে কাটাল। আগামীকালের কাজের কথা, আশী হাজার টাকার চিন্তা, ডিকি এরপর ওকে কি কাজ দিতে পারে এসব কথা ভাবতে ভাবতেই ও ঘুমোতে চাইছিল। কিন্তু পারল না। কারণ সব ভাবনা ছাপিয়ে গোল্ডীর ভাবনাটাই বারবার এসে পড়ছে। অলক অস্বস্তির সঙ্গে অনুভব করল যে মেয়েটার কথা ও যতই ভাবতে চাইছে না ততই যেন সে ওর সমস্ত চিন্তার মধ্যে ছেয়ে যাচ্ছে।

ওর সঙ্গে আলাপের পর থেকে ওর বলা কিছু কথা, গভীর কয়েকটা চাহনি, কতকগুলো বিশেষ ভাবভঙ্গী বারবার ভেসে উঠছে ওর মনে। বিশেষ করে নৈনীতালের সেই দুঘন্টার কথা কিছুতেই ও ভুলতে পারছে না।

অলক অস্থির হয়ে উঠে বসল বিছানায়। এখন কিছু কড়া হুইস্কি দরকার। এ রাতটা কোনমতে কাটাতে হবে। তারপর কালকের সন্ধ্যেটা গেলেই ও নিশ্চিন্ত। গোল্ডীর মৃত্যুর সঙ্গেই এই চিন্তার হাত থেকে ও রেহাই পাবে।

নাইট-বাল্বটা জ্বালিয়ে হুইস্কির জন্য ডাইনিং রুমের দিকে ও পা বাড়াল। আর তখনই দরজায় কয়েকটা টোকার শব্দ হল।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অলক। কে? কপালে ওর ভাঁজ পড়ল।

আর একটু অপেক্ষা করার পর বৃষ্টির আওয়াজের মধ্যে আবার টোকার শব্দ শোনা গেল।

এবার ও দ্রুত পায়ে কেবিনেটের দিকে এগিয়ে গেল। এত রাতে কে এল? এই বাংলোতে ওর কাছে ত কারুর আসার কথা নয়?

পিস্তল হাতে ও ড্রয়িংরুমে ঢুকল।

দরজা খুলে ভীষণ অবাক হল অলক। সামনে গোল্ডী দাঁড়িয়ে!

—আপনি! অলকের রুদ্ধ কণ্ঠ।

গোল্ডী তাকাল, কিছু বলল না। ঠোঁটের কানায় শুধু হাসির আভাস। যেন হাসির ছটাতেই ও বলতে চায়, হ্যাঁ আমি, দেখতেই ত পাচ্ছেন।

আরো কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অলক। তারপর ওর কণ্ঠ আপনা থেকেই সহজ হল। দরজার এ পাশে-ধরা হাতের মুঠোর মধ্যে পিস্তলটা লুকিয়ে বলল—আসুন।

গোল্ডীর মুখ জুড়ে জলের ফোঁটা। শীতে কাঁপছে। গায়ের কোট, ভিজে একাকার। বেশ কিছুটা জল কার্পেটের ওপর গড়িয়ে পড়ল।

কপাট দুটো বন্ধ করে বলল অলক, এখানে এতরাতে, কি ব্যাপার?

—সব ঘুমোচ্ছে। কেউ টের পায় নি।

অলকের প্রশ্নের উত্তর এটা ছিল না। তবু আর কিছু ও জিজ্ঞেস করল না। ওর যে এখানে আসা ঠিক হয় নি, রানীক্ষেতে অলকের সঙ্গে যোগাযোগ করা ওর যে বারণ সে সব কথাও উল্লেখ করল না। শুধু বলল, এভাবে ভিজে গেছেন? কোটটা খুলে নিন, আসছি আমি।

অলক তারপর ডাইনিং রুমের দিকে গেল। ভেতর থেকে একটা হিটার নিয়ে ফিরে এল। ঘরে ফায়ার-প্লেস আছে কিন্তু ওটাতে এখন আগুন নেই। হিটারটাই ও ঘরের কোণে নিয়ে গিয়ে জ্বালাল।

—এদিকে আসুন, শাড়িটাও তো ভিজে গেছে। শুকিয়ে নিন হিটারে।

গোল্ডী অলকের দিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে এল। সেই একই

দৃষ্টি। যেন সবসময়ই চোখদুটো অলককে কিছু বলতে চায়। এই দৃষ্টিটাকে অলক এতদিন উপেক্ষা করে এসেছে। কোনদিনই ভাল করে এই গভীর চোখের দিকে তাকায় নি। আজ ও দৃষ্টি ফেরাল না।

গোল্ডী হিটারের কাছে এসে দাঁড়াল।

আবিষ্ট চোখে অলক চেয়ে থাকে। এ-রূপের বুঝি তুলনা হয় না। জলের ফোঁটায় নরম গোলাপী মুখখানা টলটল করছে। হালকা-নীল শাড়ি-জড়ান সুঠাম দেহটায় একটা স্নিগ্ধ আবেশ। হিটারের লাল আভা ওর চোখদুটোকে আরো মোহময়ী করে তুলেছে।

দুর্ধর্ষ ক্রিমিন্যাল অলক হারিয়ে গেল সেই চোখে।

বেশ কিছুক্ষণ পর গোল্ডী বলল—আমি এসেছি বলে রাগ করলেন না ত? রানীক্ষেতে এতদিন কাছাকাছি থেকেও আলাদা হয়ে রইলাম। তাই একটু গল্প করতে এসেছি।

অলক কোন জবাব দিল না। ওর মুখ গম্ভীর হলেও তাতে রাগের কোন চিহ্ন ছিল না।

গোল্ডী আবার বলল, দীপককে আমি রাত সাড়ে নটার সময় ফোনে কালকের ডিনারের কথা বলে দিয়েছি। আচ্ছা, মিঃ মুখার্জি আমরা কালই ডিনারের পর রানীক্ষেত ছাড়তে পারি না?

গোল্ডীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই অলকের বুকটা এবার রীতিমতো টনটন করে উঠল।

গোল্ডী চোখ নামিয়ে আবার বলল, রানীক্ষেত আর মোটেই ভাল লাগছে না। এর চেয়ে নৈনীতাল অনেক ভাল। আমরা যদি কাল রাতেই নৈনীতালে ফিরে যাই, কেমন হয় বলুন ত?

—কিন্তু তারপর?

—তারপর? গোল্ডী মুখ তুলে তাকাল, একটা অদ্ভুত আচ্ছন্ন ভাব নিয়ে বলল, তারপর আপনি যা বলবেন তাই।

—আমার বলার মেয়াদ ত ফুরিয়ে এসেছে। এত দিন আমি যা বলেছি তাই করলেন। এরপর ত আমার বলার কথা নয়?

—তাহলে কি এর সাথেই সব শেষ?

গোল্ডী তাকিয়ে আছে অলকের চোখের দিকে। অলক কিন্তু এবার তাকাতে পারল না।

গোল্ডী আরো কাছে এসে দাঁড়াল। অনেক কাছে। ওর হাতের স্পর্শ অলকের সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ বইয়ে দিল। বার বার ঘুরে আসা অনুভূতিটা আবার ওকে ঘিরে ধরল। সবকিছু তোলপাড় হয়ে গেল ওর মনের ভেতর।

ক-মিনিট কেটে গেছে ও জানে না। তারপর এক সময় ও মনের আবেগ সংযত করল। হাতটা কঠিন ভাবে ছাড়িয়ে বলল, আপনি চলে যান মিস গোল্ডী। রাত অনেক হয়েছে।

—কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর?

চোখ দুটো বুজে মনের ভেতরই ছটফট্ করে উঠল অলক—না, না, আমি জানি না। প্লিজ....প্লিজ মিস গোল্ডী—আপনি এখন চলে যান।

থতমত খেয়ে গেল গোল্ডী। অলককে ও কোনদিন এভাবে দেখেনি। অন্যদিকে ফেরানো ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বোঝার চেষ্টা করল। তারপর চোখ দুটো নামিয়ে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

শেষ রাতে বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। সারারাত একটানা জল পড়ার ঝিরঝির শব্দটা এখন আর কানে আসছে না। ধীরে ধীরে আকাশের অন্ধকারটা ফিকে হতে শুরু করেছে। অলক বিছানায় উঠে বসল। হাতের অর্ধসমাপ্ত সিগারেটটা বোম্বাই-এ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজে আবার ও হুইস্কির বোতলের জন্য টেবিলের দিকে পা বাড়াল। কিন্তু খাট থেকে নেমে কি ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ল। কাল মাঝ রাত থেকে এখন পর্যন্ত দু-বোতল হুইস্কি ও শেষ করেছে। টেবিলের দিকে না এগিয়ে ড্রয়িংরুমের দিকে পা বাড়াল।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল অলক। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা আগে গোল্ডী এসেছিল এ ঘরে। আবছা অন্ধকারে ও উদ্‌ভ্রান্তের মত টলতে টলতে সোফার উপর গিয়ে বসল। চোখদুটো ভীষণ জ্বালা করছে ওর। মাথাটাও ঝিমঝিম করছে। মাত্র পাঁচ ঘণ্টার বিনিদ্র রজনী ওকে ক্লান্তিতে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সারি সারি পাহাড় যেন ওর মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়ছে একসঙ্গে।

আর তার আঘাতে ও চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ চোখ বুজে ও স্থির হয়ে রইল। এত অস্বস্তির মধ্যেও কোথায় যেন একটা আনন্দের শিহরণ বইছে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গোল্ডী কাল ওর কাছে ছুটে এসেছিল। স্বপ্নের মত রাতের প্রত্যেকটা দৃশ্য মনে পড়তে লাগল। গোল্ডীর কথাগুলো যেন আপনা থেকেই প্রতিধ্বনি করে উঠল ঘরের মধ্যে।

...রানীক্ষেতে আর ভাল লাগছে না। এর চেয়ে নৈনীতাল অনেক ভাল। আমরা যদি কাল রাতেই নৈনীতালে ফিরে যাই, কেমন হয় বলুন ত ?....তারপর ? তারপর আপনি যা বলবেন তাই...তাহলে কি এর সাথেই সব শেষ ?....

শক্ত হাতে চোখ ঘষতে ঘষতে অলক উঠে দাঁড়াল। নাঃ আর পারছে না ও। আর ভাবতে পারছে না। এই কথাগুলোর শেষেই ত গোল্ডী হাত রেখেছিল অলকের হাতের ওপর। ওর হাতের সেই স্পর্শে অলকের মনের সব বাঁধন তখন ভেঙ্গে গিয়েছিল। আর তাই মনের সংগোপনে লুকিয়ে-থাকা যে ইচ্ছে গুলোকে অলক এ ক'দিন শাসন করে রেখেছিল সেগুলো এখন ওর দেহের প্রত্যেক শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়েছে। সেই মুহূর্তে ওর মনে পড়ে গিয়েছিল কৈশোরের কথা, যে কৈশোর ও অনেকদিন আগে ছেড়ে চলে এসেছে। সে মুহূর্তে ও ভুলে গিয়েছিল ডিকির ক্লেদাক্ত জগতের বিপথগামী অলকের কথাও।

কিন্তু অলক এখন কি করবে ? এই শেষ সময়ে করার ত কিছুই নেই। বন্দুক থেকে গুলি ইতি মধ্যেই লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলেছে। এই গুলিকে ও কি করে আবার ফিরিয়ে আনবে ? না, অসম্ভব। বুকে চাপা ব্যথা নিয়ে অলক ঘুরে দাঁড়াল।

ভারী পায়ে বেডরুমের দিকেই আবার এগিয়ে গেল ও।

টেবিল থেকে হুইস্কির বোতলটা ওঠাতে গিয়ে হঠাৎ কি দেখে থমকে দাঁড়াল। টেবিলের ওপর একটা কাগজে কি যেন আঁকা। বোতলটা রেখে কাগজটাই হাতে ওঠাল অলক। দেখল, গত রাতে ওর নিজেরই আঁকা একটা স্কেচ। গোল্ডীর বাংলোটা পেন্সিল দিয়ে ও কখন যে এঁকেছে ও

নিজেই জানে না। গোল্ডীর বাথরুমটা সবচেয়ে স্পষ্ট করে এঁকেছে ও। বাথরুমের খোপে লেখা পৃথ্বিরাজ। বেডরুমে গোল্ডী। অস্পষ্ট করে আঁকা ড্রয়িংরুমে দীপক সুরায়েকা আর বারান্দায় দারোয়ান। তাছাড়া কিচেনের খোপে লেখা ছিল বাবুর্চি ও ঝি। হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যে সাতটার সময় এ বাংলোয় প্রত্যেকের অবস্থান এরকমই থাকবে। অনেকটা যেন চক্রব্যূহের মধ্যে বন্দী গোল্ডী। কিন্তু এই আঁকার কারণ কি? আঁকার সময় কি ভাব ছিল ও? অলকের নিশ্বাস দ্রুত হল। গোল্ডীকে বাঁচানোর কথা? সঙ্গে সঙ্গে ও শিউরে উঠল। মনে ভেসে উঠল ছোটেলালের বীভৎস-বিকৃত মুখটা। ডিকির স্পেশাল ফোর্সের শিকার হয়েছিল সে। না, না, গোল্ডীকে বাঁচানোর কথা আর ভাবা যায় না। এখানে স্পেশাল ফোর্স না থাকলেও পৃথ্বিরাজ আর সোহনলাল রয়েছে। বিশ্বাসঘাতককে কিভাবে শাস্তি দিতে হয় এরা তাদের চেয়ে কিছু কম জানে না।

কিন্তু···কিন্তু অলক কি সত্যিই কোন ভাবে গোল্ডীকে বাঁচাতে পারে না? একরোখা বেপরোয়া দুর্ধর্ষ অলক গম্ভীর ভাবে প্রশ্নটা এবার নিজেকে করল। আর তারপর কাগজটা নিয়ে ও বসে পড়ল চেয়ারে।

পিক-এন-ভিউ হোটেল।

ঠিক ছটার সময় পৃথ্বিরাজ ওর পোশাক পরতে উঠল। বাইরে তখন বৃষ্টি পড়েই চলেছে। ততক্ষণে সোহনলালের গোছানো শেষ। পৃথ্বিরাজ বাথরুমে ঢুকে পড়তেই ও একটা হুইস্কির বোতল নিয়ে জানলার পাশে এসে বসল।

প্রায় পনের মিনিট পর পৃথ্বিরাজ বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। ওর পরনে তখন মোটা রাফ উলের টাইট প্যান্ট, পলিয়েষ্টারের শার্টের ওপর গরম ওয়েষ্টকোট চাপানো। ভারী কোটটা তখনো পরে নি। ওয়েষ্ট-কোটের তলায় একটা স্টীলের রড, যার মাথাটা ভেলভেটে মোড়া, আর একটা ধারালো ছোরাও তার সঙ্গে লুকনো। ছোরাটা ঝকঝকে ইস্পাতের তৈরী, চওড়া প্রায় দু-ইঞ্চি, লম্বা আট ইঞ্চির মতো।

পৃথ্বিরাজকে এখন খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে। ওর ঘোলাটে চোখদুটোর দৃষ্টি যেন স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। গোল্ডীর শরীরের কথাই বোধহয় ভাবছে ও। তার সঙ্গে ডিকির নির্দেশটাও।

আরো পনের মিনিট অপেক্ষা করল ওরা। কোনো খুনের আগে পৃথ্বিরাজ মদ ছোঁয় না। তাই এতক্ষণ দাঁড়িয়ে শুধু গোল্ডীর বাংলোটার দিকে তাকিয়েছিল। সোহনলাল সাড়ে ছ-টা বাজতেই তাড়া দিল ওকে।

চাঁদমারীর জঙ্গলটা গ্রীনভ্যালী অবধি ছড়িয়ে গেছে। অনেকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে বাংলোগুলোর পেছন দিকে। গোল্ডীর বাংলোর পেছনে সেই মেঠো পথের পাশের জমিটা প্রায় ছোটখাটো খাদের মত। আশে-পাশের বাংলো থেকে ঐ খাদের ভেতরটা দেখা যায় না।

ঠিক পৌনে সাতটায় পৃথ্বিরাজ ও অলক নিঃশব্দ পায়ে চাঁদমারীর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সেই খাদের ভেতর নামতে শুরু করল। খুব আস্তে পা সামলে নামছিল ওরা। জমিটা এদিকে এবড়ো-খেবড়ো। বেশী নীচে না নেমে খাদের ধার দিয়ে ঝোপগুলো পেরিয়ে মেঠো পথটার কাছে এসে, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ওরা।

এদিকে চাপ চাপ অন্ধকার। তার ওপর ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে। মেঠো পথটা এখন একেবারে ফাঁকা। এখান থেকে গোল্ডীর বাংলোর আলোটাই শুধু দেখা যায়। মাথা একটু ওপরে ওঠালে আশেপাশের বাংলোর আলোগুলোও চোখে পড়ে। তবে মাঝে মাঝেই ওরা গ্রীনভ্যালী রোড আর দীপকের বাংলোটার ওপর নজর রাখার জন্য উঁকি মারছিল।

অলক শুধু বার বার হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে।

নিঃশব্দ শিকারীর মত ঘাসের মধ্যে ওরা পনের মিনিট নিথর হয়ে বসে রইল। তারপরই সতর্ক হয়ে উঠল দু'জন। হাতের উপর ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে ওরা দেখল, দীপক ওর বাংলো থেকে বেরিয়ে এসেছে। দীপকের পরনে লাল বর্ষাতি, এক হাতে খোলা ছাতা, আর এক হাতে চুরুট। আস্তে হাঁটতে হাঁটতে গোল্ডীর বাংলোর কাছে আসতেই ওরা মাথা নামিয়ে নিল।

অলক কিছুক্ষণ পর ওর বাঁ হাতের আস্তিন গুটিয়ে সময় দেখল।

সাতটা বেজে পাঁচ। এবার ও পৃথ্বিরাজের পিঠে টোকা মারল। পৃথ্বিরাজ তৎপর হয়ে উঠল। চট্ করে মেঠো পথের দু-পাশটা দেখে উঠে দাঁড়াল। চারপাশে আবার চোখ বুলিয়ে আলতো পায়ে এগিয়ে গেল গোল্ডীর বাংলোর দিকে। মেহেদীর ফেনসিংটা পেরিয়ে অন্ধকারের ধার ঘেঁসে গোল্ডীর বাথরুমের কাছে পৌঁছতে ওর আধমিনিটও বোধ হয় লাগল না।

অলক নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলো সেদিকে। বাথরুমের পেছন দিককার ভেজান দরজাটা আলগা হাতে খুলে পৃথ্বিরাজ ভেতরে ঢুকে পড়তেই ও উঠে দাঁড়াল।

সাতটা বেজে পঁচিশ।

গোল্ডীর বাংলোর ড্রয়িংরুমে তখন একটা মৃদু শেড-ল্যাম্পের আলো জ্বলছে। দীপক সুরায়েকা সেই আলোর পাশে সোফায় গা এলিয়ে বসে।

গোল্ডী কেবিনেটের পাশে দাঁড়িয়ে রেকর্ড বাছতে ব্যস্ত। একটা রেকর্ড হাতে নিয়ে দীপকের দিকে তাকাল ও।—কি গান শুনবেন. মিঃ সুরায়েকা?

—আপনার যা ইচ্ছে।

—তবু আপনি কি শুনতে ভালবাসেন?

—গান মাত্রই ভালবাসার জিনিস, তাই না? আপনি বাজান না একটা।

গোল্ডী হেসে মাথা নাড়ল। তারপর হাতের ওয়েষ্টার্ন মিউজিকের রেকর্ডটাই চালিয়ে দিল প্লেয়ারে।

—কি হল, আপনি যে একদম ড্রিঙ্কস্ স্পর্শই করছেন না? সামনের টেবিলে সাজানো বোতলগুলোর দিকে ইশারা করল গোল্ডী।

—আপনাকে ত বলেছি ওসব আমি ছুঁই না।

—ঠিক আছে, তাহলে আসুন, একটু নাচা যাক্। দেখেছেন, সুরটা কি মিষ্টি।

মৃদু হেসে উঠে দাঁড়াল দীপক। সুরের তালে ওরা নাচতে শুরু করল।

তখন কতক্ষণ কেটেছে কে জানে, হঠাৎ নাচ থামাতে হল ওদের। গোল্ডী শুনল, বাইরে বাংলোর দারোয়ান ডাকছে ওকে। প্লেয়ার বন্ধ করে

দরজার কাছে এগিয়ে গেল।

- মেমসাব, সুরায়েকা সাহেবের বাংলো থেকে লোক এসেছে। গোল্ডী দাঁ। তুলতেই দারোয়ান বলল।

দীপকও তখন ওর নাম শুনে এগিয়ে এসেছে দরজার কাছে। গোল্ডীর বাংলোর দারোয়ানের পেছনে ওর নিজস্ব বেয়ারাকে দেখে অবাক হল।

—কি হল, ভোলারাম?

—সাব, আপনার একটা জরুরী ট্রাঙ্ক কল এসেছে।

—ট্রাঙ্ক কল। দীপক বিস্মিত হয়—কোথেকে?

—জী-সাব, বোম্বাই থেকে।

ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়ল দীপক—আচ্ছা চল, আমি আসছি।

তারপর ভেতরে এসে ব্র্যাকেটে ঝোলান বর্ষাতি টেনে গোল্ডীকে বলল, আমি খুব দুঃখিত রাজকুমারী। ট্রাঙ্ককলটা অ্যাটেণ্ড করেই আসছি।

—নিশ্চয়ই, গোল্ডী দীপকের ছাতাটা এগিয়ে দিল ওর হাতে।

দীপক হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ল। গোল্ডী দরজা পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিয়ে সোফায় এসে বসল। এখন ওর বেশ ক্লান্ত লাগছে। ছ'দিন ধরে সেই একই রুটিন মাফিক কাজ করতে করতে ও হাঁপিয়ে উঠেছিল। অবশ্য ওর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আজ দীপককে অলক একবার পরখ করে নিলেই জানা যাবে ওর ছুটি কবে।

ঘড়ির দিকে তাকাল গোল্ডী। সাড়ে সাতটা প্রায় বাজে। হঠাৎ ওর মনে পড়ল, অলকের ত এরই মধ্যে আসার কথা। ও কি এসে পড়েছে? কথাটা ভাবতে না ভাবতেই বেডরুমের ফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল। কপাল কুঁচকে সোজা হয়ে বসল গোল্ডী। কার ফোন? মিঃ সুরায়েকার, না মিঃ মুখার্জীর? গোল্ডী উঠে বেডরুমের দিকে পা বাড়াল।

এদিকে বাইরে তখন দীপক সুরায়েকাকে ফিরতে দেখে গোল্ডীর বাংলোর দারোয়ান টুল থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। ছাতা মাথায় বর্ষাতি-পরা দীপক বেশ দ্রুত পায়ে বাংলোর লনে ঢুকল। তারপর ঠিক যখন গোল্ডী ওর বেডরুমে পা রেখেছে, দীপক ছুটতে ছুটতে ড্রয়িংরুমে ঢুকে প্লেয়ারটা

জোরে চালিয়ে দিল।

গোল্ডী ওর বেডরুমে এসে বাথরুমের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফো
রিসিভারটা হাতে ওঠাল।—হ্যালো।

—ইজ ইট প্রিন্সেসেস রেসিডেন্স ?

—স্পিকিং।

—রানীক্ষেত টেলিফোনস্ রিমাইণ্ডার সার্ভিস থেকে বলছি। আপ
যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, ম্যাডাম।

—আমার যাওয়ার সময়! কোথায় ?

—তা ত জানি না, তবে আপনার সেক্রেটারী সাড়ে সাত
আপনাকে রিমাইণ্ড করিয়ে দিতে বলেছিলেন। নমস্কার! বলেই ফো
ওদিকে অপারেটর ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে।

ওর সেক্রেটারী! গোল্ডী বেশ অবাক হয়ে রিসিভারটা না
রাখল। ওর সেক্রেটারী আবার কে! ভাবতে ভাবতে ও ঘুরে দাঁড়িয়েছি
সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমের দরজাটা খুলে গেল। পৃথ্বিরাজ প্রায় এক ল
এগিয়ে এসে গোল্ডীর মুখটা বাঁ-হাতে সজোরে চেপে মেঝেতে শুইয়ে দি
ওকে। ওর ডান হাতের স্টীলের রডটাও একই সঙ্গে ওপরে উঠল।

কিন্তু না, গোল্ডীর মাথায় পড়ল না ওটা। তাঁর আগেই বর্ষাতি
হ্যাট পরা দীপক ড্রয়িংরুমের দরজার কাছে এসে গেছে। সে ঝাঁপি
পড়ল পৃথ্বিরাজের ওপর। ওর হাতে ছিল ধারালো গাড়োয়ালী ভোজাল
নিমেষের মধ্যে সেটা পৃথ্বিরাজের বুকের বাঁ-দিকে বেশ গভীরভাবে ঢু
গেল। এক ঝলক রক্ত ছিটকে পড়ল চারদিকে। চোখে বিস্ময় নি
পৃথ্বিরাজ একটা চাপা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে।

সব কিছু দেখে গোল্ডী চীৎকার করতে গিয়ে দীপকের মুখের দি
তাকিয়ে বোবা হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়
দীপকের বর্ষাতি ও হ্যাট পরা অবস্থায় ও অলককে তখন চিনতে পেরেছে

ছুটো দেহের দিকে তাকিয়ে অলক আর দেরী করল না। ওদি
ড্রয়িংরুমে জোর আওয়াজে প্লেয়ারটা বেজে চলেছে। পৃথ্বিরাজের মর
চীৎকার সে আওয়াজ ছাপিয়ে দারোয়ান-বাবুর্চিদের কানে যে যায় নি

টু অপেক্ষা করেই ও বুঝতে পারল।

গোল্ডীর অচেতন দেহটাকে চটপট কাঁধে তুলে ফেলল অলক। এখন র সময় নেই। দীপকের আসার সময় হয়ে গেছে। অলকের নিজেরই বোম্বের ভুয়ো ট্রাঙ্ক-কলের নিঃশব্দ রিসিভারটা রেখে ও যে কোন র্তে চলে আসতে পারে। গোল্ডীকে কাঁধের ওপর নিয়ে অলক বাথরুমের ক এগিয়ে গেল।

লো থেকে অন্ধকার জমিতে নেমে খুব সতর্ক পায়ে খাদের দিকে চলতে করল অলক। বৃষ্টির জন্য গ্রীনভ্যালীর রাস্তায় এখন কেউ নেই। ছনে রেকর্ডপ্লেয়ারের আওয়াজটাকে অস্পষ্ট করতে করতে ও খাদের তর নামতে লাগল।

বড় বড় গাছের সারিগুলো পেরিয়ে কিছুদূর এসেই চাঁদমারীর সেই লটা দেখতে পেল অলক। ওখানেই ধেয়ান সিং-এর দাঁড়ানোর কথা। ল্ডীর এখনো জ্ঞান ফেরে নি। ওর দেহটা এতক্ষণ বয়ে আনতে আনতে বেশ হাঁপিয়ে উঠেছিল। ক্লান্ত পা-নিয়ে ও একটু দাঁড়িয়ে পড়ল। ছ পোলের আশে পাশে কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না। চারপাশটা র দেখল অলক। কিন্তু কোথাও ধেয়ান সিং-এর পাত্তা নেই। সাতটা কই ত ওকে এখানে থাকতে বলা হয়েছিল। তাহলে কি এখনো এসে ছয় নি ?

আস্তে আস্তে বাকী পথটুকু এগিয়ে গোল্ডীর দেহটাকে ও পোলের সর ওপর নামাল। খানিকটা জিরিয়ে তারপর আবার এদিক ওদিক াল। কিন্তু না, ধেয়ান সিং কোথাও নেই। অলক এবার চিন্তিত পড়ল। সোহনলাল নিশ্চয়ই ওদের এত দেরী দেখে অধৈর্য হয়ে ড়ছে। কি হল না হল দেখতে জীপ ছেড়ে এদিকে চলেও আসতে র। গোল্ডীর বেহুঁশ মুখটার দিকে তাকাল অলক। অন্ধকারে কিছু ঝা গেল না। তবে মনে হচ্ছে হুঁশ ফিরতে একটু সময় লাগবে। এর ্য সোহনলালকে নিরস্ত করে আসতে পারলে ভাল হত। তারপর না গোল্ডীকে পাচার করার ব্যবস্থা করা যাবে। ধেয়ান সিং কি জায়গাটা

চিনতে ভুল করেছে ?

বর্ষাতিটা খুলে সিমেন্টের চত্বরের ওপর রাখল অলক। তারপর পকে
থেকে ওর দাঁড়ি-গোঁফগুলো বের করে নৈনীতাল হাইওয়ের দিকে এগিয়ে
গেল। হাইওয়েটা পেরিয়েই ওপারে বেহড়ের জঙ্গল। রাস্তার ধারে
ছোট একটা টিলার আড়ালে সোহনলালের জীপটা থাকার কথা। টিলার
পাশেই অতল খাদ। অন্ধকারে খুব সাবধানে ও এগোলো।

নিস্তব্ধ ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে জীপটা দেখতে পেল অলক। কি
সোহনলাল জীপ থেকে বেরিয়ে এল না। দূর থেকে জীপের পেছনটা শু
দেখা যাচ্ছিল। কাছে গিয়ে দেখল, সোহনলাল সামনের সিটে ষ্টিয়ারিং
এর ওপর মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে।

—সোহনলাল! ওর গায়ে চাপড় দিতেই দেহটা আলগা পোশাকে
মত সিটের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

ভীষণভাবে চমকে পেছিয়ে এল অলক। ওর হাতের আঙুল গুলে
তখন সোহনলালের পিঠের রক্তে ভিজে গেছে। মুহূর্তের জন্য দাঁড়ি
সামনের দিকে ও ঝুঁকল। সোহনলালের নাকের নীচে হাত রাখতে
গা-টা হিম হয়ে গেল। সোহনলাল মারা গেছে। ওর মাথার পেছনে হা
রেখে বুঝল অলক, লোহার রডের আঘাতে কেউ খুন করেছে ওকে। কিন্তু—

হঠাৎ পেছনে একটা শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে অলক পকেট থেকে পিস্তল
বের করে বিদ্যুৎ গতিতে জীপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

কে যেন ঝোপের মধ্যে নড়ে চড়ে উঠেছে।

হাতের শক্ত মুঠোয় পিস্তলটা ধরে গম্ভীর স্বরে গর্জে উঠল অলক—কে
বেরিয়ে এস। না হলে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ব।

কোন জবাব এল না। আর কোন শব্দও না। অলক জীপের পেছনে
ঘাপটি মেরে বসে পরিবেশটা আঁচ করার চেষ্টা করল। পেছনে টিলা
সামনের জঙ্গলে গাঢ় অন্ধকার। ঝিরঝিরে বৃষ্টি সমানে হয়ে চলেছে
জঙ্গলের দিক থেকে হাওয়ার একটা সোঁ সোঁ শব্দ আসছে। পাশে
নিস্তব্ধ খাদে গমগমে ভাব। হঠাৎ অলকের মনে হল ওর ডান পাশে

কাছে কেউ আছে। পিস্তলটা হাতে যেমন ছিল তেমনি রেখে ও জীপের সামনে এসে ভেতরের ড্যাশ বোর্ডে সোহনলালের টর্চটা হাতড়াতে লাগল।

আর ঠিক তখনই অন্ধকার থেকে একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। লোকটা অলকের হাত থেকে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিতে চাইল। কিন্তু অলক তৈরী-ই ছিল। ছিটকে নিজের জায়গা থেকে ও সরে গেল। লোকটা ওর পায়ের কাছে পড়ে গিয়ে আবার যখন চড়াও হতে গেল তখনই অলক বুঝল যে লোকটি নিরস্ত্র। হিপ পকেটে পিস্তলটা ঢুকিয়ে এবার ও আন্দাজে ওর চোয়াল লক্ষ্য করে ছাড়ল একটা স্ট্রেটকাট্। ঠিক জায়গায় লাগল ওটা। আর একটা ঝাড়ল। লোকটা কাতরে পড়ে গেল। কিন্তু আবার দ্বিগুণশক্তি নিয়ে উঠে আসার চেষ্টা করল। অলক আর সুযোগ দিল না। ঝুঁকে ওর তলপেটে ভারী পায়ের লাথি মারল। লোকটা কঁকিয়ে এবার লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

জোরে শ্বাস নিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল অলক। জীপের কাছে গিয়ে টর্চটা নিয়ে এসে মাটিতে শুয়ে পড়া দেহটার মুখের ওপর আলো ফেলল। বিস্ময়ে কয়েক সেকেণ্ড পরিচিত মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকতে হল ওকে। লোকটা আর কেউ নয়, গ্রীনভ্যালীর খালি বাংলোর দারোয়ান মোহন সিং।

টর্চ নিভিয়ে আরো কিছুক্ষণ ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মোহন সিং-এর হাতে সোহনলালের মৃত্যু হল কেন, মোহন সিং কার লোক, নানা প্রশ্ন এল ওর মনে। তবে বেশী ভাববার সময় নেই এখন। খোলে গোল্ডী পড়ে আছে। এর পর কি করা উচিত নিমেষের মধ্যে ও ঠিক করে নিল। পৃথ্বিরাজ আর সোহনলাল দুজনেই যখন শেষ, তখন আর চিন্তা কি? গোল্ডীকে নিয়ে জীপে করে পালাবার এটাই মস্ত বড় একটা সুযোগ। কোন্ দল মোহন সিং-এর পেছনে আছে, সোহনলালকে খুন করবার উদ্দেশ্য কি, সে সব পরে ভাবা যাবে।

অলক কোন সূত্র পাওয়ার আশায় মোহন সিং-এর শার্ট আর প্যাণ্টের পকেটগুলো হাতড়ে দেখল। বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। শুধু একটা চাবির গোছা আর কিছু টাকা পয়সা। চাবির গোছাটা নিজের পকেটে

পুরে মোহন সিং-এর অচেতন দেহটাকে পাঁজাকলা করে ও তুলে নিল।

দশমিনিট লাগল খাদের ভেতর সোহনলাল আর মোহন সিং-এর দেহ-ছুটোকে তুলে ফেলে দিতে। তারপর ও হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটল চাঁদমারীর পোলটার দিকে।

নৈনীতাল হাইওয়েটা পেরিয়ে ঢালু জমির ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে অলক পোলের কাছে এল। দূর থেকেই ও বুঝতে পারল ধেয়ান সিং তখনো আসেনি। এখন অবশ্য ওকে আর দরকার নেই। ধেয়ান সিং-কে ও নিযুক্ত করেছিল গোল্ডীকে কাঠগুদাম অবধি পেঁ ৗছে দেওয়ার জন্যে। ও যে শেষ পর্যন্ত এল না কেন, সেটা যদিও চিন্তার কথা।

ভাবতে ভাবতে পোলের একেবারে কাছে এসে অলক থমকে গেল। ব্যাপার কি, গোল্ডী গেল কোথায়? ওর দেহটা ত পোলের ওপর নেই। সারা পোলটায় চোখ বুলিয়ে অলক নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কোথাও গোল্ডীর অস্তিত্ব নজরে পড়ল না।

তাহলে কি গোল্ডী জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে চলে গেছে। কিন্তু কোথায়···?

পোলের মাঝখানে উঠে অলক দিশাহারা হয়ে দু'দিকে তাকাল। অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। নৈনীতাল হাইওয়ের দিকটা আরো গাঢ় অন্ধকার। ধারের জঙ্গলের ভেতর ঢোকার কথা ভাবাই যায় না। গোল্ডী জ্ঞান ফিরে পেলেও এই অন্ধকারে পথ খুঁজে পেল কি করে?

বৃষ্টি পড়ে চলেছে। ডান হাতটাকে রুমাল দিয়ে মুছে পকেট থেকে দিয়াশলাই বার করল অলক। শরীরটা ঝুঁকিয়ে কোন মতে বৃষ্টির ছাঁট বাঁচিয়ে একটা কাঠি জ্বালাল। নীচু হয়ে জায়গাটা দেখল তারপর। না, গোল্ডীর পায়ের কোন ছাপ নেই। তার বদলে কাদায় পুরুষের জুতোর কয়েকটা ছাপ। অলকের গা দিয়ে যেন একটা বিদ্যুতের শিহরণ বয়ে গেল।

আর একটা কাঠি জ্বালাল। তারপর পায়ের ছাপগুলো অনুসরণ করে ও পোল থেকে গ্রীনভ্যালীর দিকে নামল। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই ছাপ-গুলো ঘাসের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। তবে বোঝা গেল জুতো জোড়াটা গ্রীনভ্যালীর দিকেই চলে গেছে।

সোজা হয়ে দাঁড়াল অলক। জ্বলন্ত কাঠিটা ফেলতে গিয়ে পোলের আরো নীচের দিকে তাকাতেই কিছু একটা চোখে পড়ল। ঝট করে আরো একটা কাঠি জ্বালাতে হল ওকে। একটু নীচে নেমে আসতেই চোখের সামনে ধেয়ান সিং-এর রক্তাক্ত দেহটা ভেসে উঠল।

একটা পাথরের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে ধেয়ান সিং। শরীরের ডান ধারটা একটু কাত করে যেন শুয়ে আছে। ছুরি ঢোকানোর দুটো স্পষ্ট দাগ। একটা ঠিক কোমরের নীচে পেছন থেকে। আর একটা সামনের দিকে বাঁ হাতের বগলের ধার ঘেঁষে। তাজা রক্ত মাটিতে ছড়িয়ে আছে। বৃষ্টির জলে জায়গাটা ভিজে লাল। লাশটার দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল অলক। মনটা ভারী হয়ে এল ওর। এই ধেয়ান সিং-ই দীপকের একটা বর্ষাতি আর হ্যাট ও একপ্রস্থ পোশাক যোগাড় করে দিয়েছিল। দীপকের বেয়ারাকে দিয়ে হাতিয়েছিল সেগুলো। ওর আর একটা কাজ করতে এসেই বেঘোরে প্রাণ দিতে হল বেচারাকে।

কিন্তু বিষণ্ণ ভাবটা কাটাতে হল ওকে। হঠাৎ গ্রীনভ্যালীর দিকে চোখ পড়ল। পাইনের গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে দুটো আবছা ছায়ামূর্তি হেঁটে আসছে। হাতের কাঠিটা তখনই নিভিয়ে ফেলল অলক।

ছায়া দুটো একটু দূরেই ছিল। অলক দ্রুতপায়ে নালার ধারে নেমে পড়ল। ছায়ামূর্তি দুটো পোলের কাছাকাছি এসে পড়ার আগেই গাছ-পালার আড়ালে উবু হয়ে বসে পড়ল।

ছায়াদুটো ছুটতে ছুটতে পোলের কাছে এসে পায়ের গতি কমিয়ে দিল। আস্তে পা টিপে টিপে ওরা এগিয়ে আসছে। ঝোপঝাড়ের আড়ালে অলক ঠিকমত ওদের দেখতে পারছিল না।

একটু পরেই ওরা ওর ওপরের জমিটা দিয়ে সতর্ক পায়ে পোলের ধারে এসে দাঁড়াল। ওদের দুজনের হাতেই বোধহয় পিস্তল। অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না।

ওদের মধ্যে একজন ফিস ফিস করে বলল, এখানেই গোল্ডীকে পেয়েছ?

—হ্যাঁ। সাবধানে এগিও। অলক এর মধ্যে এসে পড়তে পারে।

তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ।

লোকদুটো নিঃশব্দে পোলের ওপর উঠে পড়ল। এবার আর ওদের দেখতে পেল না অলক। তবে কথাবার্তাগুলো স্পষ্টই শোনা যাচ্ছিল।

—মনে হচ্ছে, এখনো এসে পৌঁছোয় নি।

—মোহন সিং আবার ওকে মেরে ফেলল না ত?

—তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি দেখে আসছি। তবে সাবধানে থেকো, অলক এখানে আসবেই।

লোকটা বেহড়ের জঙ্গলের দিকে চলে গেল বোধহয়। নীচ থেকে কিছু দেখা না গেলেও একজন যে পোলের ওপর ওত পেতে দাঁড়িয়ে আছে সেটা অলক বুঝতে পারল।

হতবুদ্ধি হয়ে সামনের পাথরটা ধরে আস্তে আস্তে ও উঠে দাঁড়াল। কারা এরা? দুটো গলাই অপরিচিত। মোহন সিং-এর হাতে সোহনলালের যখন মৃত্যু হয়েছে, লুসীর সঙ্গী এদের মধ্যে থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু গোল্ডীকে এরা নিয়ে গেল কোথায়? এদের উদ্দেশ্য কি· অস্থির মন নিয়ে অলক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তবে প্রশ্নগুলোর উত্তর পাবার আগে গোল্ডীকে উদ্ধার করতে হবে। দু-দুটো খুনের পর ওকে নিয়ে ওরা কি যে করবে তার ঠিক নেই। হয়ত মেরেই ফেলবে।

অলক অস্থির হয়ে ওপরে পোলটার দিকে তাকাল। গোল্ডীকে এরা রেখে এল কোথায়? গ্রীনভ্যালী রোডের সেই খালি বাংলোটার মধ্যে নয়ত? মোহন সিং-এর পকেটে পাওয়া চাবির গোছাটার কথা মনে পড়ল ওর। সঙ্গে সঙ্গে পকেটের ওপর হাত রেখে ওটা চাপ দিয়ে দেখে নিল একবার। তারপর উবু হয়ে বসে বৃষ্টির ঝিরঝির আওয়াজের সঙ্গে তাল রেখে ঘাসের উপর ঘষটে ঘষটে গ্রীনভ্যালীর দিকে নামতে শুরু করল।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে খালি বাংলোটার পেছনে গ্রীনভ্যালীর মেঠো পথের ওপর এসে দাঁড়াল অলক। বাংলোটার ভেতর সেই একই নিস্তব্ধ থমথমে ভাব। আজ চৌকিদারের ঘরেও কোন আলো নেই।

রাস্তার দুপাশে তাকিয়ে ও নিঃশব্দে বাংলোর গেটের ভেতর ঢুকে পড়ল।

পেছনের দরজার গর্তে মোহন সিং-এর চাবির গোছার দু-তিনটে চাবি

ঢোকাতেই একটা চাবি সহজেই লেগে গেল তাতে। দরজা খুলে সতর্ক হয়ে ভেতরে পা রাখল অলক। তারপর ভেতরে ঢুকে কপাটদুটো বন্ধ করে আবার চাবি লাগিয়ে দিল।

ভেতরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। পকেট থেকে পিস্তল বার করে দেয়াল হাতড়ে ও এগিয়ে গেল। ছোট ফাঁকা ঘর। পরের দরজায় হাত পড়ল। ওটাও বন্ধ। কিন্তু একটু ঠেলা দিতেই খুলে গেল। ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে শব্দ হল একটা। সামনের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল অলক। তারপর যখন বুঝল, ঘরে সত্যি কেউ নেই, তখন পকেট থেকে দিয়াশলাই বার করল। দরজাটা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি ভেজিয়ে কাঠি জ্বালাল একটা।

ড্রয়িং-রুম। তবে সাজান গোছান নয়। আসবাবপত্রগুলো এদিক ওদিক ছড়ান। কতগুলো জামা-কাপড় পড়ে আছে সোফার ওপর। মাঝ-খানে টি-টেবিলে মদের দুটো খালি বোতল। কয়েক প্যাকেট সিগারেট কতকগুলো মোমবাতি। একটা মোমবাতি তুঠিয়ে জ্বালিয়ে নিল অলক।

ঘরে বিজলীবাতির ভালই বন্দোবস্ত আছে। তবে এখানে যাদের আড্ডা তারা যে কারণে, আলো জ্বালায় না সেই একই কারণে অলকও জ্বালাল না। বাইরে থেকে তাহলে খালি বাংলোটা খালি মনে হবে না।

অলক মোমবাতিটা নিয়ে ড্রয়িং-রুমটা ভাল করে দেখে নিল। কিন্তু আর কিছু নজরে পড়ল না ওর। এবার ও বাঁ-দিকের ঘরের দিকে গেল।

দরজার ছিটকিনি খুলে জোরে ঠেলতে হল ওকে। বিরাট বেডরুম ঘরটা সুন্দর সাজানো, কোথাও কোন অগোছালো ভাব নেই। অলক নীচু হয়ে মেঝের ওপর ধুলোর পুরু আস্তরণটা দেখে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। পায়ের কোন ছাপ পাওয়া গেল না। তার মানে ঘরটাকে এরমধ্যে ব্যবহার করা হয় নি। ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করে ডানদিকের ঘরের দিকে পা বাড়াল অলক।

এবার ঠিক ঘরে ঢোকা হয়েছে। এ ঘরে অনেক রকম জিনিসপত্র। বিছানাটা দেখে বোঝা গেল কয়েকদিন ধরে ওটা ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশের চেয়ারে একটা স্যুটকেস্। দেয়াল ঘেঁষে টেবিলের ওপর টুকিটাকি নানা ধরনের জিনিস। শেভিং সেট, আয়না ও কয়েক প্যাকেট সিগারেট।

মোমবাতি দিয়ে পুরো ঘরটাকে ঘুরে দেখল অলক। তারপর বাথরুমে ঢুকল। কিন্তু কোথাও গোল্ডীকে পাওয়া গেল না।

অলক একটু নিরাশ হল। এখানে ওকে পাওয়া যাবে, ভেবেছিল। কিন্তু এই বাংলোতে আর ঘর নেই। মানে, গোল্ডীকে এখানে আনাই হয় নি।

চিন্তিত অলক বিছানার পাশে এসে চেয়ারের ওপর রাখা স্যুটকেসটা খুলে হাতড়াতে লাগল। কারা এরা, কি এদের উদ্দেশ্য, কিছু যদি সূত্র পাওয়া যায়। কিন্তু পুরুষের জামাকাপড় ছাড়া তাতে আর কিছুই ছিল না।

অলক এবার টেবিলের কাছে গিয়ে দেরাজটা খুলল। কতগুলো কাগজ-পত্র। সবচেয়ে ওপরে ট্যুরিস্ট অফিসের রানীক্ষেতের একটা ম্যাপ। তার নীচে ভাঁজ করা একটা কাগজ। সেটা খুলে পড়ল অলক। একটা ঠিকানা লেখা। 'পি .ভার্মা, স্যাভয় হোটেল, রুম নং ১২, নৈনীতাল।'

আর একটা বড় খাম ছিল দেরাজের ভেতর। খামটা নিয়ে ভেতরে তাকাল অলক। পাঁচ-ছটা হাফ সাইজের ফটো। ফটোগুলো বের করে আলোয় দেখতে গিয়েই ও ভীষণ চমকে উঠল। একি, সবগুলো ত ওরই ফটো। ওর আর গোল্ডীর। নৈনীতালে ওদের ঘুরে বেড়ানোর সব ছবি।

চোখে বিস্ময় নিয়ে ফটোগুলো ও একের পর এক দেখতে লাগল। প্রথম দুটো ছবিতে স্নো পিকের তলায় ওরা দুজন পাশাপাশি হাঁটছে। তৃতীয় ছবিতে অলক গোল্ডীকে হাত ধরে স্নো পিকের একটা উঁচু জায়গায় ওঠাচ্ছে। আর দুটো ছবিতে দেখা যাচ্ছে ওরা ঝোপের ভেতর বসে গল্পে মত্ত। সবচেয়ে নীচের ছবিটায় অলক উঁচু গাছ থেকে ফুল পাড়ছে আর পাশে গোল্ডী দাঁড়িয়ে।

ছবিগুলো দেখেই বুঝল অলক যে এগুলো টেলিলেন্সে তোলা। কারণ ওর চোখকে ফাঁকি দিয়ে কাছ থেকে কেউ এ ছবি তোলে নি সে বিষয়ে ও নিশ্চিত। কিন্তু এই ফটোগুলো তোলার অর্থ কি? খামটা হাতে রেখেই নেগেটিভগুলো পাওয়া যায় কি না দেরাজ হাতড়ে দেখতে গেল অলক। আর ঠিক তখনই কোথায় যেন জুতোর মৃদু শব্দ হল।

চট্ করে মোমবাতিটা নিভিয়ে ফেলল অলক। খামটা শার্টের ভেতর ঢুকিয়ে দেরাজ বন্ধ করে টেবিলের কাছ থেকে সরে এল। নিঃশব্দে পা টিপে

ড্রয়িং রুমের দরজার কাছে এসে কান পেতে রইল মুহূর্তের জন্য।

খট্ খট্···অস্পষ্ট একটা শব্দ। তবে বাংলোর ভেতরে নয়, বাইরে। কে যেন বাইরের গোল বারান্দাটা ঘুরে পেছন থেকে সামনের দিকে আসছে। মনে হল খুব সাবধান হয়েই হাঁটছে সে।

তাহলে কি বাংলোর ভেতরে অলকের উপস্থিতির কথা কেউ জানতে পেরেছে? শব্দটা এখন ঠিক কোথায়, আঁচ করে নিল অলক। তারপর ড্রয়িংরুমের দেয়াল হাতড়ে পেছনের ছোট ঘরটায় এসে ঢুকল।

আওয়াজটা সামনের দিকে চলে যেতেই নিঃশব্দে চাবি ঢুকিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল ও। এদিক ওদিক তাকিয়ে দরজা আবার বন্ধ করল। তারপর শক্ত মুঠোয় পিস্তল ধরে একলাফে পেছনের গেটের পাশের ঝোপটায় লুকিয়ে পড়ল।

ততক্ষণে পুরো গোল বারান্দাটা চক্কর লাগিয়ে আগন্তুক বাংলোর পেছনের দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকার ঝোপের মধ্য থেকে গেটের বাতিটার আবছা আলোয় দেখল অলক, আগন্তুক আর কেউ নয়, লুসি। লুসির হাতে একটা ছোট টর্চ। টর্চের আলোটা দরজার চাবির গর্তের ওপর ফেলে কি যেন দেখছে সে। দরজার হাতলটা তারপর দু-একবার ঘুরিয়ে খুলতে না পেরে লুসি টর্চ নিভিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

সিঁড়ি দিয়ে ওকে নামতে দেখেই অলক বুঝল লুসির এখানে আসার কথা ছিল এখন। কিন্তু আসল লোকেরা কেউ নেই বলে ওকে ফিরে যেতে হচ্ছে। তার মানে মোহন সিং, লুসি ও লুসির সঙ্গী এরাই হচ্ছে এই অদৃশ্য দলের লোকেরা। তাহলে কি গোষ্ঠী লুসির হোটেলেই আছে? লুসি গেট দিয়ে বেরিয়ে যেতেই অলকও অন্ধকার ঘেঁষে ওর পেছন পেছন চলতে শুরু করল।

কিন্তু নৈনীতাল হাইওয়ের মোড়ে এসে লুসি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। হাইওয়ের ডানদিকে তাকিয়ে একটা গাছের আড়ালে নিজেকে চটকরে লুকিয়ে ফেলল ও। অলককেও মেঠোপথটার ধারে আরো অন্ধকারে ঢুকে পড়তে হল।

একটা লোক চাঁদমারীর জঙ্গলের দিক থেকে প্রায় ছুটতে ছুটতে

আসছে। লোকটা মেঠোপথের কাছে এসে ম্যালের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েক মিনিট কি যেন দেখে নিয়ে তারপর গ্রীনভ্যালীর খালি বাংলোটার দিকে ছুটে এল। সামনে দিয়ে সে চলে যেতেই অলক চিনতে পারল ওকে, লুসির সেই সঙ্গী। কিন্তু লুসি ওকে দেখে লুকোল কেন? অলকের চোখমুখ কুঁচকে উঠল। অন্ধকার থেকে লুসির দিকে তাকাল ও। লোকটা বাংলোর ভেতরে চলে যেতেই লুসি দ্রুতপায়ে অলকের প্রায় ধার ঘেঁষেই বাংলোর গেটের ঠিক সামনের গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

লুসির সঙ্গী বাংলোর ভেতরে গিয়ে কি করছে অলকেরও দেখা দরকার। কিন্তু লুসির জন্য ও ঝোপের আড়াল থেকে বেরোতে পারল না। তাছাড়া নিজেরই সঙ্গীর ওপর লুসির এভাবে আড়ি পেতে দেখাটা ওকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে।

কয়েক মিনিট ধৈর্য ধরে একই ভাবে বসে থাকতে হল ওকে। বাংলোর দিকে কানদুটো সজাগ রেখে লুসির ভাবভঙ্গী ও একদৃষ্টিতে দেখতে লাগল। গেটের আবছা আলোয় দেখল অলক, লুসি বেশ উদ্‌গ্রীব হয়ে বাংলোর ভেতর উঁকি মেরে দেখছে। একটু পরেই ওর মুখটা গাছের আড়ালে চলে গেল। লোকটা আবার বেরিয়ে এল বাংলো থেকে। ওকে দেখে মনে হল, বেশ অস্থির হয়ে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে সে। যে ভাবে এসেছিল সে ভাবেই হন্তদন্ত হয়ে এবার সে দীপকের বাংলোর পেছনধারের জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল। তার মানে চাঁদমারীর দিকেই আবার যাচ্ছে লোকটা।

লুসি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। ওধারে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে এবার ও নৈনাতাল হাইওয়ের দিকে পা বাড়াল।

অলকও বেরিয়ে এল মেঠো পথটায়। একবার দীপকের বাংলোর পেছন দিকটার জঙ্গলের দিকে তাকাল, আর একবার লুসির দিকে। মুহূর্তের জন্য ভাবল কিছু। তারপর আবার লুসির পেছন পেছন চলতে শুরু করল।

রেক্স হোটেলের দেতলার আট নম্বর স্যুটে ঢোকার মিনিট খানেকের মধ্যেই অলক ওর দরজায় টোকা মারল। করিডরের এপাশ ওপাশ দেখে পিস্তলটা ও কোটের পকেটে শক্ত হাতেই ধরে রেখেছিল। করিডরটা তখন ফাঁকা।

দরজাটা খুলতেই চট্ করে ভেতরে ঢুকে বাঁ হাতে কপাটদুটো বন্ধ করে দিল অলক। ডানহাতের পিস্তলটা তখন লুসির বুকের মধ্যে ঢোকানো।

—নো সাউণ্ড প্লিজ, বেবি! একটা কথাও নয়।

—তুমি! বুকের ওপর উদ্যত পিস্তল দেখে লুসি যতটা অবাক হয়েছিল, তার চেয়েও বেশি অবাক হল অলককে দেখে।

—হ্যাঁ, আমি, পিস্তল দিয়ে ওর বুকে একটা ধাক্কা দিল অলক। কোথায় ওকে লুকনো হয়েছে দেখি?

প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে লুসি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল।—আচ্ছা, তার মানে, তুমি এসব নষ্টামির গোড়া।

—আর একটুও দেরী নয়। বলে ফেল কোথায় সে? তা নাহলে তোমাকে মেরেই খুঁজব আমি।

—কার কথা বলছ?

—উঁহু, খ্যাকা সেজোনা। রানীক্ষেতে যে খুকি হয়ে আস নি তা আমি জানি।

—ইউ স্কাউণ্ড্রেল! লুসি এবার ফোঁস করে উঠল, আমিও জানতে চাই রানীক্ষেতে তোমরা কেন নিয়ে এসেছ আমাকে?

অলক লুসির মুখের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে ওকে বোঝার চেষ্টা করল। তারপর পিস্তলের বাঁটটা ওর বুকের ওপর আলতো ভাবে ঠুকতে ঠুকতে বলল—লক্ষ্মী মেয়ের মত আমার সঙ্গে এস ত, ঘরটা খুঁজে দেখব আমি। কোন প্যাঁচ যদি চালাতে যাও তাহলে জেনে রেখ এই বুক এফোঁড় ওফোঁড় করেই ছাড়ব। নাও পেছন ফের!

অলকের স্বরে অন্যরকম ঝাঁজ ছিল এবার। পিস্তল ধরা ওর শক্ত মুঠোর দিকে তাকিয়ে লুসি বুকে নিশ্বাসের ঢেউ খেলিয়ে আস্তে আস্তে পেছন ফিরে দাঁড়াল। ওর পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে অলক ভালভাবে ঘরটাকে দেখতে শুরু করল।

তবে খুঁজে দেখার তেমন কিছু ছিল না। ছিমছাম সাজান দুটো ঘর। লুকনোর জায়গা বলতে কিছুই নেই। গোল্ডী এখানে থাকলে এমনিতেই চোখে পড়ত। তবু লুসিকে সঙ্গে করে খাটের নীচ, ওয়ারড্রবের ভেতর আর

বাথরুমের দরজাটাও খুলে দেখে নিল অলক। শেষ পর্যন্ত যখন বুঝল গোল্ডী সত্যি এখানে নেই। তখন ও লুসিকে নিয়ে আবার সামনের ঘরটায় এল।

পিস্তলের ধাক্কায় ওকে কোচে বসিয়ে ডান পা-টা টি-টেবিলের ওপর উঠিয়ে বলল —এবার বল, রানীক্ষেতে কোন ফিকিরে এসেছ?

লুসি ক্ষেপে গিয়ে কোচে থেকে উঠতে যাচ্ছিল। আবার ওকে ঠেলে বসিয়ে দিল অলক।—দাঁড়াও, দাঁড়াও। বল, কি জন্য এসেছ? গম্ভীর স্বরে প্রশ্নটা আর একবার ও করল।

—ন্যাকা কে, আমি না তুমি? বক্রদৃষ্টিতে তাকাল লুসি।

—আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

—আমিও চাই আমার প্রশ্নের জবাব। কোচের ওপর হাত চাপড়ে উগ্রকণ্ঠে বলল লুসি।

ভুরু কুঁচকে লুসির মুখটাকে আবার যাচাই করল অলক। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—আচ্ছা, তার মানে বলতে চাও, তুমি জাননা কেন এসেছ এখানে?

—কেন এসেছি না, কেন নিয়ে আসা হয়েছে? লুসির চেহারায় কোন ভণিতা ছিল না। আবার ও ঝাঁজিয়ে বলল—আমাকে নিয়ে তোমাদের প্ল্যানটা কি সেটা না জেনে আমিও তোমাদের ছাড়ছি না। মনে রেখ, সব জেনেই আমি রানীক্ষেত থেকে যাব।

অলক লুসির মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দেয়ালের দিকে তাকাল। একটু আগে গ্রীনভ্যালীর মেঠো পথটায় লুসির নিজের সঙ্গীর ওপর আড়ি পেতে নিরীক্ষণ করার কথাটা মনে পড়ল ওর। তাছাড়া রানীক্ষেতে প্রথম দিন চাঁদমারীর পোল থেকে ফেরার সময় ওকে যে ভাবে খালি বাংলোটার ওপর উঁকি মারতে দেখেছিল সেই দৃশ্যটাও ভেসে উঠল ওর মনে। ও বুঝল, লুসিকে নিয়ে কোথাও একটা গণ্ডগোল আছে, এতক্ষণ ধরে ও যে অভিনয় করছে না, তা স্পষ্ট। পিস্তলটা কোটের পকেটে ঢুকিয়ে টেবিল থেকে পা নামাল অলক। এবার ও সহজ গলায় জিজ্ঞেস করল—তোমাকে নিয়ে যে লোকটা এসেছে সে কে?

—বাঃ কায়দাটা ভাল বার করেছ ত? লুসি কোচে হেলান দিয়ে বাঁকা ভাবে হাসল। নিজেদের লোক নিয়ে মসকরা?

নীচের দিকে তাকিয়ে একটু ভাবল অলক। তাহলে কি লুসি এর মধ্যে নেই? কিন্তু লুসির কথাই যদি সত্যি হয় তাহলে লোকটা ওকে এখানে নিয়ে এসেছে কেন? অবশ্য এখন একমাত্র লুসিই এই রহস্যের সমাধান করতে পারে। কিন্তু মুশকিল হল মেয়েটা ওকে ওর সঙ্গীর দলের লোক ভাবছে। তারপর লুসি যা মেয়ে ওর কাছ থেকে কথা বার করা আরো কঠিন। পিস্তল দেখিয়ে ওর মত মেয়ের কাছ থেকে কোন কিছু বার করা যাবে না। অবশ্য রাস্তা একটা আছে।

অলক হঠাৎ ঝুঁকে লুসির চিবুকটা ডান হাতের দু আঙুলে ধরে নাড়া দিল—শোন সুন্দরী, আমি তোমার সঙ্গীটির সঙ্গে নেই। তুমি আমাকে ভুল বুঝছ। আমার এক বন্ধুকে এরা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। ইচ্ছে করেই বান্ধবী কথাটা বলল না অলক। —ওদের গ্রীনভ্যালীর আড্ডায় খোঁজ করতে গিয়েই তোমাকে দেখলাম। তাই তোমার পেছন পেছন এদ্দুর এসেছি। তোমাকে এদের সঙ্গে দেখে অবাক হয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারছি তুমি এর মধ্যে নেই। যাই হোক রানীক্ষেত আমাকেও ছাড়তে হবে। আর তোমার এই সঙ্গীর ব্যাপার-স্যাপার আমিও জানতে চাই। তারপর না হয় আমরা এক সঙ্গে ফিরব, কেমন?

অলকের আন্তরিক স্বর ও হাতের স্পর্শ লুসির মুখের ভাব একটু পালটে দিল। তবু প্রশ্নসূচক ভঙ্গীতে সে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

অলক লুসির ডান হাতটা ধরে সজোরে চাপ দিল—কি, একসঙ্গে ফিরতে রাজী ত?

কোচ থেকে উঠে অলকের কাছে এসে দাঁড়াল লুসি।—কবে যাবে, কাল?

—কাল কেন, আজ রাতেও যেতে পারি। লুসির কাঁধ জড়িয়ে হাত রাখল অলক।—তবে তার আগে এরা তোমায় নিয়ে এসেছে কেন সেটা ত জানা চাই? আর আমার বন্ধুকেও খুঁজে বার করতে হবে। আচ্ছা, এই লোকটির সাথে তোমার যোগাযোগ হল কি করে?

—কলকাতাতেই। আমাদের বারে দু-একদিন এসেছিল লোকটা।

—তারপর?

—একদিন বলল, আমাকে নাকি ওর খুব ভাল লেগেছে। তাই

কয়েকদিনের জন্য আমার সঙ্গে ও কোথাও বেড়াতে যেতে চায়। ততক্ষণে লুসিও অলককে জড়িয়ে ধরেছে।—আমি কি আসতাম? নেহাত তুমি সেদিন তোমার ফ্ল্যাটে আমাকে ও ভাবে দুঃখ দিলে বলেই রেগে-মেগে চলে এসেছি।

এজন্য কত টাকা পেয়েছে লুসি, তা আর জিজ্ঞেস করল না অলক। ওকে নিয়ে ও সোফায় বসল। লুসি অলকের কাঁধের ওপর মাথা রেখে হাত দিয়ে পিঠ জড়িয়ে ওকে নিজের উত্তেজিত বুকের ওপর টেনে আনল। অলক ওকে এ ভাবে কোনদিনই সুযোগ দেয় নি। তাই লুসি যেন আজ বাঁধন হারা। অলকের শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বলল—অলক ডিয়ার, তুমি বিশ্বাস কর, তোমাকে ছাড়া আমি আর কারো কথা ভাবি না।

অলক ওর শার্টের ওপর লুসির হাতটাকে আলতোভাবে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল—লোকটার সম্বন্ধে আর কি জান তুমি?

—কিছু না।

—নাম?

—প্রেম ভার্মা।

নামটা শুনেই চমকে উঠল অলক। এই নামটাই ত ও দেখেছিল খালি বাংলোর দেরাজে পাওয়া কাগজটায়।—তোমরা কি নৈনীতালেও ছিলে? হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে অলক।

—ছিলাম। কিন্তু তুমি জানলে কি করে?

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল অলক। —গত পরশুও গ্রীনভ্যালী রোডের দিকে গিয়েছিল কেন?

অলকের দিকে একটু অবাক হয়ে তাকাল লুসি। অবশ্য অলক যে কোন্ জগতের ছেলে ও ভালভাবেই জানে। তাই ওকে আর কতকগুলো প্রশ্ন করে অনর্থক সময় নষ্ট করতে চাইল না ও। সোফার ওপর অলককে প্রায় কাত করে নিজের স্কার্টটা ও খুলতে লাগল।

এবার ওর হাতটা শক্ত হাতে ধরল অলক। —প্লিজ, আমার প্রশ্নের জবাব দাও। কেন গিয়েছিল ঐ বাংলোর দিকে?

লুসি এবার গম্ভীর ভাবে বলল—ভার্মার ওপর নৈনীতাল থেকেই

সন্দেহ হয়েছে আমার। লোকটা আমাকে বেড়াবে বলে নিয়ে এসেছে, কিন্তু আমাকে নিয়ে ও কখনোই বেশিক্ষণ থাকে নি। ওর হাবভাব দেখেই আমি আন্দাজ করেছিলাম, আমায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্য অন্য কিছু। নৈনীতালে ওর সুটকেশ ঘেঁটে একটা চিঠি পড়ে তারপর গ্রীনভ্যালীর বাংলোর ব্যাপারটা জানতে পারি।

—কি লেখা ছিল তাতে?

—ছোট্ট একটা কথা—গ্রীনভ্যালী রোডের প্রথম খালি বাংলোটায় কুলদীপ নামে কারো সঙ্গে ওকে দেখা করতে হবে। আর লেখা ছিল, দেখা-সাক্ষাৎটা যেন খুব সাবধানে হয়। সেজন্যই প্রথম দিন ওকে ফলো করে ঐ খালি বাংলোটার কাছে গিয়েছিলাম।

—কুলদীপকে দেখেছ?

—হ্যাঁ, ভার্মার সঙ্গে এর মধ্যে অনেকবার কথা বলতে এসেছে। অবশ্য কথাবার্তাগুলো ওরা আমার আড়ালেই সারে।

—কুলদীপ কি রকম দেখতে?

তারপর লুসির কাছে কুলদীপের বর্ণনা শুনে ব্যাপারটা অলকের কাছে আরো রহস্যময় হয়ে দাঁড়াল। নৈনীতালে যে অ্যামবাসাডার গাড়ির সঙ্গে ওদের জীপের ধাক্কা লেগেছিল, সে গাড়ির ড্রাইভারই যে কুলদীপ—সেটা বুঝতে কষ্ট হল না। তাছাড়াও একটু আগে চাঁদমারীর অন্ধকারে দেখা ছায়ামূর্তি দুটোর মধ্যেও যে সে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অলক লুসির আলিঙ্গন ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল।—ভার্মা কখন বেরিয়েছে?

—সাড়ে ছ'-টা। অলকের হাবভাব দেখে ক্ষণিকের কামনায় উদ্দীপিত লুসির মুখটা চুপসে গেল—তুমি কি বেরুচ্ছ?

—হ্যাঁ, আমার বন্ধুটির খোঁজে।

—কিন্তু কলকাতায় আমরা একসঙ্গে ফিরছি ত?

দরজার দিকে যেতে যেতে ঘাড় নাড়ল অলক—হ্যাঁ, তবে এর মধ্যে ভার্মা ফিরলে আমার কথা যেন টের না পায়, দেখো।

—এক সেকেণ্ড, অলক। লুসি প্রায় দৌড়ে অলকের কাছে এল।—আর একটা জায়গা তোমার দেখা বাকী আছে।

—কোথায়? চট করে ঘুরে দাঁড়াল অলক।

—এই হোটেলেরই তিন-তলার একটা স্যুট। ওটা ভার্মা আজকেই ভাড়া করেছে। অবশ্য যার জন্য করেছে সেও আজ সন্ধ্যের সময় এসে গেছে।

গোল্ডীকে লুকিয়ে রাখার আসল জায়গাটার হদিশ যেন এতক্ষণ পর সত্যিই পাওয়া গেল। অলক উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল—লোকটা কি এখন স্যুটের ভেতরেই আছে?

—থাকার ত কথা। সন্ধ্যে সাতটার সময় এসেছে। আমার কাছ থেকে স্যুটের চাবি নিয়ে গেছে। ভার্মার খোঁজ করছিল। বলল, ও এলেই যেন ওর আসার কথা বলা হয়।

—এই লোকটা কি রকম দেখতে?

লুসির বর্ণনা শুনে চিনতে পারল না অলক। দাঁড়িয়ে একটু ভেবে বলল, যাই হোক্, ঐ স্যুটটাও দেখে যেতে হবে। তুমি কি আসবে আমার সঙ্গে?

—নিশ্চয়। স্কার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে এগিয়ে এল লুসি।

তিনতলায় উঠে নির্দিষ্ট স্যুটটা ইশারায় দেখাল লুসি। অলক ওটা পার হয়ে, করিডরের একপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল। এই স্যুটের ভেতর একজনের বেশিও থাকতে পারে। সেটা যাচাই করার জন্যই লুসিকে ও সঙ্গে নিয়ে এসেছে। দরজাটা ওকে দিয়ে খুলিয়ে তারপর ও ভেতরে ঢুকতে চায়।

লুসি দরজায় নক করল? একবার দু-বার, তিনবারের বার জোরে। কিন্তু দরজা খুলল না, কোন সাড়াও এল না। দরজাটা যতটা পারা যায় ঠেলে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল লুসি। তারপর ও অলকের কাছে এগিয়ে এল।

—ভেতরে কেউ নেই।

—ঠিক বলছ?

—হ্যাঁ, তবে আলো জ্বলছে, এক্ষুনি চলে আসতে পারে। অবশ্য এই ফাঁকে ভেতরটা দেখে নেওয়ার একটা উপায় ছিল।

লুসির এত উৎসাহ দেখে একটু বিস্মিত হলেও অলক বুঝতে পারল, ওর সঙ্গে একসাথে কলকাতা ফেরার টোপটা গিলেছে লুসি। উদগ্রীব হয়ে ও

জিজ্ঞেস করল—কি ভাবে ?

—ভার্মার জন্য হোটেলের দেওয়া এর ডুপ্লিকেট চাবিটাও আমার কাছে আছে। আমি নিয়ে আসব ?

—না, তোমাকে আনতে হবে না। চল, আমি যাচ্ছি।

অলক লুসির সঙ্গে দ্রুত পায়ে নীচে নামল।

লুসিকে নীচে রেখে অলক একটু পরে একাই চাবিটা নিয়ে উপরে ছুটে এল। করিডরে তখনো কোন লোকজন নেই। নিঃশব্দে স্যুটের দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকে আবার চাবি লাগিয়ে দিল অলক।

ভেতরে আলো জ্বলছে। তবে টেবিল-ল্যাম্পের মৃদু আলো। অলক হাতে পিস্তল ধরে প্রথম ঘরটা ভালভাবে দেখল। ড্রয়িংরুমের মত সাজানো ঘর, দেখার কিছুই নেই। ভেতরের ঘরটায় আরো সাবধান হয়ে ঢুকল।

ঘরটা অন্ধকার। একটু দাঁড়িয়ে বাতিটা জ্বালাল। ওয়ারড্রব, কেবিনেট, ইজিচেয়ার ও দুটো খাট পাতা। সব কিছুই দেখল অলক। না গোল্ডী কোথাও নেই। তার পরেই বাথরুমটা খুলে দেখতে যাবে এমন সময় বাইরের দরজায় চাবি ঢোকানোর শব্দ হল। চাপা পায়ে এক লাফ দিয়ে অলক ঘরের বাতিটা প্রথমে নেভাল। তারপর চারদিকে তাকিয়ে দরজার একটা কপাটের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

দু-জোড়া পায়ের শব্দ। সামনের ঘরটায় কথা বলতে বলতে ঢুকল ওরা। প্রথম গলাটা বেশ উত্তেজিত।

—এখন বাজে পৌনে-এগারোটা। সাড়ে সাতটার সময় তোমাদের কাজটা হওয়ার কথা ছিল। ওটা ফোনে জেনেই আমি এসেছি। আর এখন বলছ ব্যাপার গুরুতর, কিছুই হয়নি। স্ট্রেঞ্জ, তোমাদের মত দু-দুটো পাকা লোক পাঠিয়ে আমি দেখছি ভুল করেছি। কি বলতে চাও ? সবকিছু আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে ?

—না, একেবারে যায়নি। তবুও ব্যাপারটা গুরুতর। পুরো ঘটনাটা শুনলে বুঝতে পারবেন।

শেষের গলাটা চিনতে পারল অলক। একটু আগে চাঁদমারীর পোলে এই গলাটাই ও শুনেছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে অলক দেখল ওরা কোচে

বসে পড়েছে। একজন, লুসির সঙ্গী ভার্মা। আর এক জনকে ও চিনতে পারল না। চেহারায় বেশ হোমরা-চোমরা ভাব, চোখে চশমা, মধ্য বয়েসি। দামী পোশাকের সঙ্গে গাম্ভীর্য মিলে বেশ রহিস রহিস ভাব। লোকটা ভারিক্কি গলায় বলল—হুম, বল, কি তোমার ফিরিস্তি।

—প্রথম কথা হল, খবরটা আমরা ভুল পেয়েছি। গোল্ডীর সঙ্গে একমাত্র অলক-ই এখানে আসেনি। ওর আরো দুজন সাগরেদ ছিল।

—ইজ ইট? কি করে জানলে?

—কুলদীপ আর মোহন সিং তিনদিন আগে অলককে ওর বাংলো থেকে ম্যালের দিকে ফোকাসিং করতে দেখেছে। ও তখন পিক-এন-ভিউ হোটেলের দুজন সাগরেদদের সিগন্যালিং এর জবাব দিচ্ছিল। চাঁদমারীর জঙ্গলে সেদিনই ওদের দেখা হয়। কুলদীপ তখন ওকে ফলো করে ওদের কথাবার্তা শুনে জানতে পারে যে গোল্ডীকে অলক খুন করবে না, করবে ঐ দুজনের মধ্যে একজন, তার নাম পৃথ্বিরাজ।

—এই ব্যাপার। তারপর?

—ওদের খুনের প্ল্যানটা অবশ্য সেদিন হয় নি। হয়েছিল তার পরের দিন। তবে সেদিন গ্রীনভ্যালীতে আমাদের বাংলোর ওপর অলকের সন্দেহ হয়েছিল।

—কেন?

—আমি রেক্স থেকে সেদিন বাংলোতে কুলদীপের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি জানতাম না কুলদীপ তখন চাঁদমারীর জঙ্গলে। আর আমি এও জানতাম না যে অলকের সঙ্গীরা আমাকে লুসির সঙ্গে এই হোটেলে উঠতে দেখছে। লুসিকে ওরা ভাল করে চেনে। শুধু তাই নয়, চাঁদমারীর জঙ্গল থেকে ফেরার পথে ওরা আমাকে ঐ বাংলো থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে। অলক তখন বাংলোতে ঢুকে একটা চক্কর দিয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা কুলদীপ ওদের পেছনে ছিল বলে লক্ষ্য করেছিল।

—তারপর?

—কুলদীপের কাছ থেকে সব শুনে আমি সাবধান হয়ে যাই। বাংলোর দিকে কাল পর্যন্ত আর যাই নি। কুলদীপ মোহনসিংকে সে রাতেই

অলকের বাংলোতে পাঠিয়েছিল। ওর চাকরের সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলে আসতে যাতে অলকের ধারণা হয় যে খালি বাংলো খোঁজার উদ্দেশ্যেই আমি সেখানে গিয়েছিলাম। গতকাল সকালে আমিও ওর সঙ্গীদের ভাঁওতা দেবার জন্য এখানে এদিক ওদিক খালি বাংলো খোঁজার ভান করি। এতেই ফল হয়েছে। কুলদীপ ওদের কথাবার্তা শুনেই সেটা বুঝতে পেরেছিল। তারপর ওদের মধ্যে আরো ঠিক হয় যে আজ সন্ধ্যের সময় দীপককে গোল্ডী ডিনারের নেমন্তন্ন করবে—

এরপর অলকদের গোল্ডী-হত্যার আগাগোড়া প্ল্যানটা হুবহু বলে গেল ভার্মা। সব শুনে তাজ্জব বনে গেল অলক। কুলদীপ লোকটা ওদের কথাবার্তা শুনল কি করে? চাদমারীর জঙ্গলে ঐ ঘুটঘুটে অন্ধকারে লোকটা নিশ্চয়ই ওদের কাছাকাছি কোথাও লুকিয়েছিল। কিন্তু ওরা ত যথেষ্ট সাবধান হয়েই কথাবার্তা বলেছে।

কানদুটো সজাগ করে আবার শুনল অলক। ভার্মা তখন বলছে—ওদের এই প্ল্যান শুনেই আমাদেরও নতুন করে প্ল্যান করতে হল তারপর। মোহনসিংকে বেহড়ের জঙ্গলে অলকের এক সঙ্গীকে মারার জন্য হাজির রাখলাম। কুলদীপ গোল্ডীর বাংলোতে পৃথ্বিরাজের ঢোকার পরেই বাথরুমের বাইরে গরম জল করার বয়লারের পাশে লুকিয়েছিল। পৃথ্বিরাজ বেরিয়ে এলেই ও বাংলোতে ঢুকত। আমি গ্রীনভ্যালির কাঁচা রাস্তার মোড়ে নৈনীতাল হাইওয়ের ওপর দাঁড়িয়েছিলাম। অলক যাতে ফোনটা করেই পৃথ্বিরাজের আগে বেহড়ে পৌঁছতে না পারে সেজন্য ওকে আটকে রাখার কথা ছিল আমার। কারণ মোহনসিং তখন ওর একজন সঙ্গীকে মেরে পৃথ্বিরাজকে খতম করার জন্য ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দুজনকেই শেষ করে বেহড়ের খাদে ফেলে দেবার কথা ছিল। সবই ঠিকমত হয়েছিল। কিন্তু অলক যে এরকম করবে জানতাম না।

—কি করেছে সে?

—পৃথ্বিরাজ গোল্ডীকে মারার আগেই ও পৃথ্বিরাজকে খুন করেছে।

—কি বলছ তুমি!

—হ্যাঁ, আমরাও অবাক হয়েছি। ডিকির দলে থেকে নিজের

লোককে ও খুন করবে ভাবতে পারি নি। তারপর গোল্ডীকে নিয়ে ও পালাতে গিয়েছিল। এই কাজে ওর চাকর ধেয়ানসিংকে ও কাজে লাগিয়েছিল। তাকে খতম করেছি আমরা। শেষ পর্যন্ত গোল্ডীকে নিয়ে ও পালাতে পারেনি। চাঁদমারীর জঙ্গল থেকে গোল্ডীকে উঠিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু তারপর থেকে অলককে পাওয়া যাচ্ছে না। মোহন সিংও নিপাত্তা। আমার মনে হয়, মোহনসিংকে মেরে ওর সঙ্গীর লাশের সঙ্গেই বেহড়ের খাদে ওকে ফেলে দিয়েছে অলক।

—মাই গড, এত কাণ্ড হয়ে গেছে এর মধ্যে? কিন্তু গোল্ডীকে কোথায় রেখেছ?

—ওর বাংলোতেই।

—দীপকের খবর?

—ওকেও গোল্ডীর বাংলোর একটা ঘরে আটকে রাখা হয়েছে।

—আর পৃথ্বিরাজের লাশটা?

—ওটাকে আমরা বেহড়ের খাদে ফেলে এসেছি।

—তার মানে একমাত্র অলক এখন বাইরে। কিন্তু ওকে ত চাই ভার্মা।

—নিশ্চয়ই, তবে রানীক্ষেত ও ছাড়ে নি। এটা নিশ্চিত। গোল্ডীর জন্য ও এখানে কোথাও আছে। কুলদীপকে সেজন্য বেহড়ের জঙ্গলে জীপটার কাছাকাছি রেখে এসেছি। কারণ অলক পালালে ঐ জীপে করেই পালাবে।

—তার মানে? গোল্ডী ও দীপককে তোমরা এভাবে বাংলোয় একা ছেড়ে এলে! অলক যদি ওদিকে যায়।

—বাংলোর দারোয়ানটা আমাদের লোক। ওকে আমি ঠিকমত চোখ রাখতে বলেছি। ঝি আর বাবুর্চিটাকে অবশ্য মেরে ফেলা হয়েছে।

—গেট আপ, আর সময় নষ্ট কর না। আজ রাত শেষ হবার আগেই অলককে খুঁজে বার করতে হবে। শেষ পর্যন্ত যদি ওকে না-ই পাও তাহলে শেষ রাতে গোল্ডী আর দীপকের কাজটাই সেরে রেখ। বাট অলক মাষ্ট বি ট্রেসড আউট।

পর্দার ফাঁক দিয়ে অলক দেখল ওরা দু-জনেই উঠে দাঁড়িয়েছে। ভার্মা

দরজার দিকে এগিয়ে গেল। হোমরা-চোমরা লোকটা চাবি বার করে দরজা খুলে দিল।—আমি তোমার খবরের জন্য অপেক্ষা করব।

ভার্মা বেরিয়ে যেতেই আবার দরজায় চাবি লাগিয়ে দিল সে।

অলক এবার শক্ত মুঠোয় পিস্তল ধরে পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল।

—একটুও নড়ো না। হাত তুলে দাঁড়াও।

ঘুরে দাঁড়িয়েই পিস্তল উঁচিয়ে একজনকে সামনে দেখে বেশ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল লোকটা। তবে চোখের পলকে সব বুঝে নিয়ে বিদ্যুত বেগে কোটের পকেটে ডানহাতটা ঢুকিয়েও ছিল। সঙ্গে সঙ্গে অলকের বাঁহাতের একটা ভারী ঘুষি এসে পড়ল হাতটায়। কোটের-পকেটে-ধরা পিস্তলখানা ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল।

অলক বাঁ পা দিয়ে নিমেষের মধ্যে পিস্তলটা চেপে ধরল।—জানি সহজে ধরা দেবার লোক তুমি নও। পিস্তল দিয়ে ওর বুকেও একটা চাপ দিল অলক।—হাতদুটো ওঠাও।

—কে তুমি? হাত উঠিয়ে অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করল সে।

—সে পরে হবে। আগে তুমি কে বল?

—বলে আমার লাভ?

—প্রাণটা তাহলে বাঁচত। তা নাহলে তোমাকে খতম করেই গ্রীন-ভ্যালীর দিকে যেতে হবে।

—ও, অলক! বিড় বিড় করে উঠল লোকটা।

—হ্যাঁ, ফালতু সময় নষ্ট করার লোক নই আমি। পিস্তলের ধাক্কায় লোকটাকে দরজার ওপর নিয়ে ফেলল অলক।—বলে ফেল। আর একটু দেরী করলে বেহড়ের খাদে তোমাকেও যেতে হবে।

অলকের কঠিন চোখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল সে—প্রদীপ সুরায়েকার লোক আমি।

—প্রদীপ সুরায়েকা!

দীপকের ভাই! ডিকি কাজটা ত তার হয়েই করছে? অলক একটু স্তম্ভিত হল।

ওর বিস্ময়ের মুহূর্তটুকুর সুযোগ নিয়ে বাঁ-হাত দিয়ে পাশের দেয়ালে

টেবিল-ল্যাম্পের তারটা ছিঁড়ে ফেলল লোকটা। আর সঙ্গে সঙ্গেই নীচু হয়ে অলকের বাঁ পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পা-টা জাপটে ধরে অলককে ফেলে দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

অলক ঝুঁকে তার আগেই লোকটাকে কলার ধরে ওপরে দাঁড় করাল। পিস্তলটা হিপপকেটে ঢুকিয়ে লোকটার থুতনি আর চোয়ালে মোক্ষম কয়েকটা ঘুসি মারল। যতক্ষণ না লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ততক্ষণ ও ঘুসি চালিয়ে গেল। তারপর অন্ধকার হাতড়ে মেঝের পিস্তলটা উঠিয়ে ঘরের আলো জ্বালাল।

লোকটা তখন মেঝেতে শুয়ে হাঁপাচ্ছে। ওর চোয়াল আর থুতনি ফেটে রক্ত ঝরছে। অলকের ঘুসির চোটে চেহারার আদলই পালটে গেছে লোকটার। ওকে এবার ওঠার ইশারা করল অলক। কোনমতে জোরে শ্বাস নিতে নিতে হাতে ভর দিয়ে উঠে বসল সে।

পকেট থেকে নিজের পিস্তলটা বার করে কলার ধরে লোকটাকে আবার দাঁড় করাল অলক। তারপর ঠেলতে ঠেলতে দেয়ালের দিকে নিয়ে গিয়ে পিস্তলের নলটা ওর বুকে ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করল—নাম কি তোমার?

উত্তেজনায় অলকও তখন হাঁপাচ্ছে। ওর ইস্পাত-কঠিন মুখ আর অস্বাভাবিক চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে লোকটা বিড় বিড় করে বলে উঠল—জি, পি, গুপ্তা।

—ঠিক ঠিক জবাব দাও, শয়তান! কিছু লুকোবার চেষ্টা কোরো না। পিস্তলের নলটা গুপ্তার চোয়ালে ঠেকিয়ে বেশ গম্ভীর গলায় বলল অলক—প্রদীপ সুরায়েকা কেন পাঠিয়েছে তোমাদের?

পিস্তল থেকে চোয়ালটা একটু দূরে সরিয়ে কাঁপা স্বরে জবাব দিল সে—তোমাদের গোল্ডী খুনের পরে দীপক সুরায়েকাকে শেষ করবার জন্যে।

—দীপক! যাকে আমরা গোল্ডীর খুনি সাজাতে এসেছি? অলক অবাক হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে উঠল—কি বলতে চাও তুমি? ওর ত এমনিতেই গোল্ডী খুনের দায়ে ফাঁসি হত?

অলকের দাবড়ানির চোটে আরো জড়সড় হয়ে গেল লোকটা। চট করে জবাব দিল—না, এ নিয়ে ভয় ছিল প্রদীপ সুরায়েকার। এর আগেও

দু-দুটো মেয়েকে জখম করে যে পুলিসের ছোঁয়ার বাইরে রয়েছে সে হয়ত এই সাজান খুনের কেসেও পার পেয়ে যেত।

অলক ভুরু কুঁচকে তাকাল ওর দিকে। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল। প্রদীপ সুরায়েকা ডিকিকে দিয়ে দীপককে খুনী সাব্যস্ত করার প্ল্যান করিয়েছে। আবার সে নিজেই দীপককে শেষ করতে লোক পাঠাল। কিন্তু কেন? লোকটার কলার ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল অলক—নৈনীতালে গোল্ডীর গাড়ির সঙ্গে অ্যাকসিডেণ্টটা করেছিল কে? তোমাদের কুলদীপ?

একটু অবাক হয়ে লোকটা থুতনি নাড়ল।

—কারণ? আমাদের আটকে রেখে ফটোগুলো তোলার জন্য?

অলক যে ওদের এত খবর রাখে জেনে লোকটা ঘাবড়ে গেল। জুলজুল চোখে তাকিয়ে মিনমিন করে বলল—হ্যাঁ।

—কিন্তু কেন? ঐ ফটোগুলো দিয়ে তোমরা কি করতে? অলকের পিস্তলটা তখন গুপ্তার বুকের ওপর নেমে পড়েছে। ও চুপ করে থাকতে নলটা ও বুকের মধ্যে স্ক্রুর মত ঘুরিয়ে দিল।—জবাব দাও, নাহলে বুঝতেই পারছ। তোমাদের সব খবরই রাখি। ভালয় ভালয় সব ঠিকঠিক বল। তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেব। ফটোগুলো তুলেছিলে কেন?

—পুলিসের চোখে তোমাকে গোল্ডীর আসল প্রেমিক সাজাতে। নিস্তেজ গলায় গুপ্তা জবাব দিল এবার।—যাতে দীপকের খুনী তোমাকে মনে করা হয়।

এইবার অলকের কাছে আগাগোড়া রহস্যটা পরিষ্কার হল। অলক যে গোল্ডীর সঙ্গে আসছে এটা ডিকির কাছে জেনেই তাহলে, প্রদীপ সুরায়েকা তার পরিকল্পনাটা করেছে। তার মানে, পুলিসের সন্দেহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই দীপককে ঐভাবে সরাতে চেয়েছে সে? প্রদীপ সুরায়েকার প্ল্যানের পুরো ছবিটা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। গোল্ডীর মত মেয়ে যোগাড় করে তাকে বিশেষ অবস্থায় খুন করার ভার ছিল ডিকির ওপর। আর এদের ওপর ভার ছিল অলককে গোল্ডীর প্রেমিক প্রমাণ করে দীপককে খুন করা। যাতে ওকেই দীপকের খুনী সাব্যস্ত হতে হয়। শিউরে উঠল অলক। প্ল্যানটা সত্যি সাংঘাতিক!

এই প্ল্যান শেষ পর্যন্ত যদি টিকত তাহলে দীপকের মৃত্যুতে তার ভাই প্রদীপ স্থরায়েকার ওপর কারো সন্দেহ হত না। আর সেই হত মগনলাল-ছগনলাল কোম্পানীর একমাত্র উত্তরাধিকারী। অলক যে দীপককে খুন করেছে পুলিস সেটা গোল্ডী-অলকের ফটো দেখেই বিশ্বাস করত। যৌন-উন্মাদ দীপকের হাতে একজন ক্যাবারে ড্যান্সার খুন, যেমন স্বাভাবিক তেমনি তার প্রেমিকের হাতে দীপকের খুন হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়।

অলক কলার ছেড়ে একটা শুকনো হাসি হাসল—বুঝলাম। তোমার মালিকের ফন্দির সত্যিই তুলনা হয় না। কিন্তু লুসিকে কেন নিয়ে এসেছ তোমরা? ওকে নিয়ে কি ফিকির ছিল বলবে এবার?

অলকের পিস্তলের চাপে লোকটা দেয়ালের দিকে আরো হটে গেল। —ওকে আমরা ডিকির চোখকে ফাঁকি দেবার জন্য নিয়ে এসেছিলাম।

তারপর যা বলল লোকটা তার মর্মার্থ বুঝে অলককে আর একবার শিউরে উঠতে হল। দীপক খুনের ব্যাপারটা প্রদীপ স্থরায়েকা পুলিসের চোখেই শুধু সাজাতে চায় নি, ডিকিকেও এ নিয়ে ধোঁকা দেবার ফিকির করেছিল ও। কারণ ও জানত ডিকি একটি সাংঘাতিক লোক। ওর প্ল্যানের ওপর আর একটা প্ল্যান করে ওরই দলের লোক, অর্থাৎ অলকের ফটো পুলিশের হাতে দেবার ব্যবস্থা করেছে প্রদীপ, এটা জানলে পর ডিকি যে ওকেও পুলিসের হাতে ফাঁসিয়ে দিতে পারে তার ভয় ছিল ওর। সে জন্যই গোল্ডীর সঙ্গে অলক আসছে এটা জেনে প্রদীপের চেলা-চামুণ্ডারা এমন একজন লোক খুঁজছিল যার সঙ্গে অলকের কোন শত্রুতা আছে। খুঁজতে খুঁজতে ওরা লুসিকে পায়। অলকের ওপর লুসির ভীষণ আকর্ষণ। কিন্তু কোন কারণে ইদানীং আবার ওর ওপর খাপ্পাও সে। এটা জেনেই ওরা লুসিকে লুফে নেয়। তারপর ওদের সঙ্গে ওকে আসতে রাজি করায়।

ডিকিকে এরা অন্যরকম বোঝাতে চেয়েছিল। অর্থাৎ লুসি যেন অলকের সঙ্গে গোল্ডীর যোগাযোগ টের পেয়ে ওদের রানীক্ষেত পর্যন্ত ফলো করে। ঘোরাফেরাটা সন্দেহের মনে হতেই ও নৈনীতালে ওদের ফটোগুলো তুলে নেয় যে ফটোগুলো শেষ পর্যন্ত পুলিসের হাতে যায়।

এই ফটো নিয়ে অলককে ঝামেলাতে ফেলার উদ্দেশ্য ছিল লুসির। কিন্তু শেষকালে গোল্ডীর সঙ্গে দহরম-মহরম সহ্য করতে না পেরে প্রতিহিংসায় ও অলককে খুন করে।

এই পর্যন্ত শুনে অলক চোখ টান টান করে বিদ্রুপের স্বরে বলল, আচ্ছা! আমাকেও খতম করার কথা ছিল তোমাদের ?

—তা ছাড়া উপায় ছিল না। ভয়ে ভয়েই যেন বলল গুপ্তা, তুমি বেঁচে ফিরলেই ডিকি জানতে পারত যে দীপক তোমার হাতে খুন হয় নি। কিন্তু ওকে আমরা বোঝাতে চেয়েছিলাম যে গোল্ডীকে খুন করতে গিয়েই দীপকের কাছে বাধা পেয়ে তাকেও শেষ করতে বাধ্য হয়েছ তুমি।

—তাহলে গোড়াতেই গলদ ছিল তোমাদের ? পৃথ্বিরাজের কথা ভাবই নি দেখছি ?

—হ্যাঁ। সেখানেই ভুল হয়েছে। ডিকি যে আর একজনকে খুন করতে পাঠাতে পারে সেটা আমাদের মাথায় আসে নি।

—লুসিকে নিয়ে তোমরা কি করতে ?

—ওকেও আমরা শেষ করতাম। তোমাদের দুজনকে এমন ভাবে খতম করা হত যে সবাই বুঝত তোমরা দুজনে নিজেদের হাতেই খুন হয়েছ।

সব শোনার পর ডান হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল অলক। এগারটা বেজে পঞ্চাশ। আর দেরী করা ঠিক নয়। লোকটাকে এবার ঠেলে ওয়ারড্রবের সামনে দাঁড় করাল। —ওয়ারড্রবের চাবি কোথায় ?

কেবিনেটটা ইশারায় দেখাল গুপ্তা।

পিস্তলটা ওর দিকে সোজা রেখেই অলক কেবিনেটের দিকে পেছিয়ে এসে চাবিটা বার করল। তারপর গুপ্তার হাতে ওটা দিয়ে ওয়ারড্রবটা খুলতে বলল।

গুপ্তা আস্তে আস্তে ওয়ারড্রবের পাল্লা দুটো খুলে অলকের দিকে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকাল। ঘাড় নেড়ে ওকে ভেতরে ঢুকতে নির্দেশ দিল অলক। গুপ্তা আড়ষ্ট ভাবে ওয়ারড্রবের দিকে একটু এগিয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল। পেছন থেকে পিস্তল দিয়ে জোরে একটা ঠেলা মারল অলক।

ওয়ারড্রব বন্ধ করে চাবি আর গুপ্তার পিস্তলটা কেবিনেটের ওপর রেখে

ও সোজা দরজার দিকে ছুটল।

কিন্তু অলক জানত না যে লুসি এতক্ষণ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ওদের সব কথাবার্তা শুনছিল। গুপ্তাকে যে অলক ওয়াড্রবের ভেতর আটকে রাখতে যাচ্ছে এটা জেনেই লুসি নিঃশব্দ পায়ে নিজের স্যুটে ফিরেও গিয়েছিল।

নীচে নেমে অলক দেখল লুসি ওর স্যুটের দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। গুপ্তার ঘরের চাবিটা ওকে ফিরিয়ে দিতেই লুসি নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করল।—কি হল, পেলে না তোমার বন্ধুকে ?

—না, ওখানেও নেই।

—তাহলে এত দেরী কেন ?

—লোকটা ফিরে এসেছিল, আর তোমার ভার্মাও। সেজন্য একটু অপেক্ষা করতে হয়েছে। আচ্ছা, চলি। অলক সিঁড়ির দিকে এগলো —দেখা যাক, অন্য কোথাও যদি পাওয়া যায়।

—আবার আসছ নিশ্চয়ই। দাঁতে দাঁতে চেপে অলককে বিদায় দিল লুসি। এক ঝাঁক নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে শুধু আওড়াল—গোল্ডী, ক্যাবারে ড্যান্সার। সে তোমার বন্ধু ? ওর জন্য মিছে সোহাগটা করে গেলে আমার সঙ্গে ? আচ্ছা।

অলকের ছায়াটা সিঁড়ির মধ্যে মিলিয়ে যেতেই লুসি ঝড়ের বেগে ওপরের দিকে ছুটল। আড়ি পেতে ওদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে কি করবে না করবে সব ঠিক করে নিয়েছিল ও। ওকে যারা খুন করতে নিয়ে এসেছে সেই ভার্মা, কুলদীপ আর গুপ্তাকে ও পুলিসের হাতে ত দেবেই, তবে তার আগে এদের হাতে অলককে ওর বান্ধবী সুদ্ধ শিক্ষাটাও দিয়ে নিতে চায়। কলকাতার সেই দাম্ভিক অলক শেষ পর্যন্ত ওর প্রেয়সীর জন্য ওকে বোকা বানিয়ে গেল এটা ও কোনমতেই সহ্য করতে পারছিল না।

গুপ্তার স্যুটের দরজা খুলে লুসি সোজা ভেতরের ঘরে ঢুকে কেবিনেটের ওপর থেকে পিস্তল আর ওয়ারড্রবের চাবিটা উঠিয়ে নিল। পিস্তলটা ডানহাতে কায়দা করে ধরে ওয়ারড্রবটা বাঁ হাতে খুলল।—বেরিয়ে এস,

শয়তান! পিস্তল নাড়িয়ে কড়া স্বরে গুপ্তাকে বাইরে আসতে নির্দেশ দিল লুসি।

পিস্তল-হাতে লুসিকে দেখে বিপর্যস্ত গুপ্তা আরো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। চুপচাপ বাইরে বেরিয়ে ফ্যাল ফ্যাল চোখে চেয়ে রইল ওর দিকে।

—এখন দেখছি একেবারে ভিজে বেড়াল সেজে গেছ। কিচ্ছু জান না, না? রক্ত-চোখে গর্জন করে উঠল লুসি, আমাকে খুন করাই ধান্দা ছিল তাহলে? ইউ বাষ্টার্ড! এখন যদি তোমাকে শেষ করি আমি?

লুসির মুখের কঠিন ভাব দেখে গুপ্তা একটু পেছিয়ে গেল।

কিন্তু লুসি তখন সত্যি সত্যি অলক আর গোল্ডীর প্রতি প্রতিহিংসায় দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। ঠোঁট কুঁকড়ে বলল—না, খুন তোমায় করব না। যাও বাছাধন, তোমাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। অলক আর গোল্ডীকে চাই ত?

গুপ্তার চোখদুটো চকচক করে উঠল। ওয়ারড্রবটা আঁকড়ে জোরে মাথা নেড়ে সায় দিল।

—দেন গো, হারি আপ! তোমার সঙ্গীদের খবর দাও। একই স্বরে বলল লুসি—তোমরা যতক্ষণ না আসছ ততক্ষণ ওদের আমি আটকে রাখব। কি, মগজে কিছু ঢুকল?

—আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল গুপ্তা।

—দাঁড়াও, গোল্ডীর বাংলোটা কোথায়?

—গ্রীনভ্যালী রোডে। তুমি কি চিনবে?

—তোমাদের খালি বাংলোটার কাছে?

—হ্যাঁ, তার পরের পরেরটা। কিন্তু তুমি—!

—যাও, যাও, দেরী কর না। পাখী তাহলে পালাবে ওদিকে। লুসিও দরজার দিকে পা বাড়াল। —আর শোন, ওদের নিয়ে যা করার কর। আমাকে ধরার চেষ্টা আবার কর না। তোমার পিস্তলটা যে আমার কাছে রয়েছে, সেটা খেয়াল রেখ। কথাটা শেষ করে লুসি আর দাঁড়াল না। ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল।

গুপ্তাও সম্বিত ফিরে পেয়ে, ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ছুটতে ছুটতে গ্রীনভ্যালী রোডের মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল অলক। ঘুরে চারদিকটা একবার ভাল করে দেখে নিল। সারা রানীক্ষেত ঘুমিয়ে আছে। রাস্তার কয়েকটা আলো ছাড়া আর সব দিকে অন্ধকার। বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু ঠাণ্ডা পড়ছে কনকনে।

গ্রীনভ্যালী রোডের প্রথম বাংলোটার দিকে অলক সতর্ক পায়ে এগিয়ে গেল। উঁকি মেরে দেখল—না, কেউ নেই কম্পাউণ্ডের ভেতর। বাংলোর ভেতরেও কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। এবার ও রাস্তার আলোগুলো বাঁচিয়ে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে গোল্ডীর বাংলোর দিকে এগোতে লাগল।

বাংলোটার কাছে এসে দেখল, বারান্দায় কেউ নেই। আলোটা জ্বলছে শুধু। চৌকিদারটা এদিক ওদিক কোথাও ঘুমোচ্ছে কিনা বোঝা গেল না। গেট পর্যন্ত এসে বাগানটা খুঁটিয়ে দেখে তারপর ও ভেতরে ঢুকল। দৌড়ে লনটুকু পেরিয়ে বারান্দার বাতিটা নিভিয়ে পিস্তল হাতে দেয়ালে পিঠ ফিরে দাঁড়াল কিছুক্ষণ।

না, কেউ এল না। বাংলোর ভেতরেও কোন শব্দ নেই। দরজাটা এবার ও হাতড়ে দেখল। ভেতর থেকে বন্ধ। তার মানে দরজা ভেঙ্গে ঢোকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কিন্তু তার আগেই একটা দ্রুত পায়ের শব্দ শুনে ও ঘুরে দাঁড়াল। চৌকিদারটা বোধ হয় বাংলোটার চক্কর দিচ্ছিল। বারান্দার বাতি নেভা দেখেই হোক বা অলকের উপস্থিতি বুঝতে পেরে, ও তখন পাশের লন থেকে ছুটে আসছে। অলক পিস্তলটা পকেটে ঢুকিয়ে চট করে কাঠের থামের আড়ালে এসে দাঁড়াল। তারপর চৌকিদারটা যখন ওর প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন আচমকা বেরিয়ে ওর চোয়াল আর তলপেটে পরপর দুটো ঘুষি মারল। অপ্রস্তুত অবস্থায় আঘাত পেয়ে চৌকিদার লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ঠিকমত বেহুঁশ হয়েছে কিনা একবার দেখেই দরজাটা ভাঙ্গার জন্য অলক প্রস্তুত হল।

ডান কাঁধ দিয়ে জোরে কয়েকটা ধাক্কা মারতেই ভেতরে ছিটকিনিটা ভেঙ্গে পড়ল। তীব্র বেগে গোল্ডীর বেডরুমের দরজার কাছে এসে শেকল

খুলে ভেতরে ঢুকল। ঘরটা অন্ধকার। দেয়াল হাতড়ে লাইট জ্বালাল অলক।

গোল্ডী হাত পা বাঁধা অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছে। মুখে একগাদা কাপড় গোঁজা। কোনমতে ঘাড় ঘুরিয়ে অলকেয় দিকে তাকাল ও। ওকে দেখেই বোঝা গেল এ অবস্থায় অনেকক্ষণ ধরে অমানুষিক কষ্ট পাচ্ছে ও।

অলক আর এক সেকেণ্ডও দেরী করল না। পিস্তলটা বিছানার ওপর হাতের নাগালের মধ্যে রেখে গোল্ডীর মুখে গোঁজা কাপড়গুলো টেনে বার করল। তারপর হাত-পায়ের বাঁধনগুলো খুলতে লাগল।

গোল্ডী বোবার মত চেয়ে রইল অলকের দিকে। ওর চোখে মুখে পৃথিরাজ খুন হওয়ার সময়ের সেই ভয়ংকর আতঙ্কের ভাবটা তখনো কাটেনি। দড়ির বাঁধনগুলো খুলে ওকে ইশারায় উঠতে বলল অলক। কিন্তু পারল না গোল্ডী। ভয় আর এতক্ষণের বন্দী অবস্থা ওর দেহকে সম্পূর্ণ অচল করে ফেলেছে। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠতে গিয়ে ও পড়ে গেল বিছানায়। অলক ঝুঁকে সাহায্য করল। এক হাতে পিঠ জড়িয়ে অন্য হাতে কাঁধ ধরে ওকে আস্তে আস্তে বিছানায় বসাল।

—আর ভয়ের কোন কারণ নেই শোভনা, একটু সামলে নাও, তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যেতে হবে আমাদের। দুহাতে গোল্ডীর কাঁধ দুটো ধরে ওকে বিছানা থেকে নামিয়ে মেঝের ওপর দাঁড় করাল অলক। হাত ছেড়ে দিতেই গোল্ডী অর্থাৎ শোভনা আবার পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু অলক সামলে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে ওকে ভীষণ অবাক করে দিয়ে বিছানার চাদরটা কে যেন খাটের মাথার দিক থেকে এক ঝটকায় টেনে নিল। পিস্তলটা চাদরের সঙ্গে দরজার কাছে ছিটকে পড়ল। অলকও সঙ্গে সঙ্গে গোল্ডীকে ছেড়ে বিদ্যুৎ বেগে ওদিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। কিন্তু পিস্তল হাতে লুসির মারাত্মক মূর্তিখানা দেখে ওকে থমকে যেতে হল।

—নো মুভমেণ্টস। হাতের পিস্তলটা নাড়িয়ে জ্বালাধরা গলায় বলল লুসি। এক চুল নড়েছ কি গুলি ছুটবে, জেনে রেখ। তারপর ডানহাতের পিস্তলটা সোজা রেখে, ঝুঁকে মেঝের পিস্তলটা বাঁহাতে উঠিয়ে নিল ও।

ওর দিকে তাকিয়ে অলকের চোখের কোল কেঁপে উঠল। পিস্তল হাতে

লুসির মুখের ভাব তখন ভয়ংকর। গোল্ডী আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে বসে পড়ল বিছানায়।

—আচ্ছা, এই তোমার বন্ধু! চোখদুটো কুঁচকে গোল্ডীকে নিরীক্ষণ করল লুসি।—কি নাম যেন, গোল্ডী। বাঃ খাসা মেয়ে যোগাড় করেছ ত। তা একে ছেড়ে আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবে বলছিলে কেন? তা কি হয়, তোমরা একই সঙ্গে যেও। তবে একটু অপেক্ষা কর, ওরা এসে পড়লেই আমি ছেড়ে দেব।

—কাদের কথা বলছ? অলক এদিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

—যারা তোমায় খুঁজছে।

এবার বুঝল অলক, এর মধ্যে লুসির সবকিছু জানা হয়ে গেছে। গুপ্তার স্যুট থেকে বেরিয়ে নীচে ও লুসিকে বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। কথাটা মনে পড়তেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। লুসির মত মেয়েকে চিনেও ও সাবধান হতে পারল না? মনে মনে নিজেকে গালাগাল দিল অলক।

চোখের মণি আবার ঘরের চারপাশটায় ঘুরিয়ে বলল, বোকামি কর না লুসি। এরা তোমাকেও খুন করতে এনেছে, জান সেটা?

—ওফ্, আমার জন্য দরদে দেখছি কলজে তোমার ফেটে পড়ছে। লুসি ব্যঙ্গের হাসি হাসল।—কলকাতার ফ্ল্যাট থেকে ন্যাংটো অবস্থায় বের করে দেবার সময় এ দরদ ছিল কোথায়?

টেলিফোনের টেবিলের নীচে পৃথ্বিরাজের সেই স্টীলের রডটা তখনো পড়ে আছে। ওটার দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল অলক। একটু নরম সুরে বলল, সে নিয়ে এখন মাথা গরম করছ? এখন আমরা এখানে তিন জনই মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আছি, প্লিজ পিস্তল নামাও লুসি। চল আমরা তিনজন পালিয়ে যাই। এরা এসে পড়লে কেউই কিন্তু বাঁচব না।

—হা...হা...হা, পিস্তল দুলিয়ে এক দমক হাসি হাসল লুসি।—তিনজন? রেক্সের ঝুটো সোহাগের বেলায় ত দু-জন ছিলাম, এখন তিনজন? কি পেয়েছ তুমি আমাকে? কলকাতায় না হয় পাত্তাই দিতে না, তা বলে এখানে এই নাচিয়েটার জন্য গায়ে হাত বুলিয়ে বোকা বানিয়ে যাবে? ওটা হতে দিচ্ছি না খোকা। আমি ঠিক পালাতে পারব। তবে তার আগে ঐ

শকারী কুকুরগুলোর হাতে তোমাদের না ছেড়ে যাচ্ছি না। বলতে বলতে ধমকে উঠল লুসি।—সোজা হয়ে দাঁড়াও। কোন কায়দা দেখাতে যেও না। তোমাকে যে আমি ভাল করে চিনি সেটা মনে রেখ। একটু এদিক ওদিক করলেই গুলি বেরিয়ে যাবে আমার পিস্তল থেকে।

অলক সোজা হয়েই দাঁড়িয়ে রইল। খোঁচা-খাওয়া বাঘিনীর মতই মেয়েটা এখন বিপজ্জনক। এ অবস্থায় নড়াচড়া করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু টেলিফোন-টেবিলের নীচে রডটার কথা মনে রেখেছে ও। কুলদীপ, ভার্মা এসে পড়ার আগেই যা কিছু হয় করতে হবে। কিন্তু উপায় কিছু তখনই ওর মাথায় এল না। অলক অস্থির হয়ে উঠল। তারপরই বাইরে পায়ের শব্দটা শোনা গেল। ওরা এসে পড়ল বোধহয়।

লুসি পিস্তলটা ওদের দিকে তাক-করা অবস্থায় রেখেই খোলা দরজা দিয়ে একটু পেছিয়ে দাঁড়াল। কুলদীপ আর ভার্মার সামনে আরো সাবধান হয়ে থাকতে হবে, যাতে ওরা অলক গোষ্ঠীকে ধরলেও ওকে কিছু না করতে পারে।

ড্রয়িংরুম পর্যন্ত পেছিয়ে ওদের দেখার জন্য বাইরের দিকে আড়চোখে তাকাল লুসি। কিন্তু···টলতে টলতে কে আসছে ওটা? লুসি অবাক হয়ে গেল। ভার্মা, কুলদীপ, গুপ্তার মধ্যে কেউ নয় ত?

লুসির এই অসতর্ক মুহূর্তের সুযোগটা হারাল না অলক। চোখের পলকে নীচে ঝুঁকে স্টীলের রডটা উঠিয়ে লুসির ডান হাতে সজোরে ছুড়ে মারল। অব্যর্থ লক্ষ্য। রডের আঘাতে লুসির ডান হাতের পিস্তলটা ফসকে ড্রয়িংরুমের আর এক দিকে গিয়ে পড়ল। একই সঙ্গে ড্রাইভ মারার ভঙ্গীতে লুসির পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অলক। বাঁ হাতের পিস্তলটা যাতে ও কাজে লাগাতে না পারে সেজন্য ওর পা-দুটো ধরে, জোরে টান দিল। লুসি পিস্তল-হাতে পড়ে গেল মেঝেতে। কিন্তু মেঝেতে পড়ার আগেই পিস্তলের ট্রিগারটা ও টিপে ফেলেছিল। গুলিটা গিয়ে লাগল বাইরের দরজায় চৌকিদারের গায়ে। বাগানে এতক্ষণ বেহুঁশ পড়ে থেকে জ্ঞান ফিরে পেয়ে সবে সে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। পেটে গুলিটা লাগতেই আর্তনাদ করে সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

গুলির শব্দ শুনেই গোল্ডী বিছানা থেকে ছুটে এল ড্রয়িংরুমের দরজায়।

লুসিকে মেঝেতে ফেলে অলক তখন ওর হাতের পিস্তলটা ছিনিয়ে নিতে ব্যস্ত। দু'জনে কার্পেটের ওপর ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে। লুসি আর একটা গুলি ছোড়ার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। অলক কোনমতে হাঁটু গেড়ে লুসির বাঁ হাতের কব্জিটা ধরে চাপ দিল। শেষ পর্যন্ত হাতের মুঠি আলগা করতে পারল। কিন্তু মেঝেতে পড়ে-থাকা অন্য পিস্তলটা তখন লুসির ডান হাতের নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে। লুসি ওটাকে ধরার জন্যে পিঠ ঘষটে ওপরের দিকে সরে গেল।

হতভম্ব গোল্ডী সম্বিত ফিরে পেয়ে এবার ছুটে এল পিস্তলটার দিকে। আর ঠিক লুসির হাত ওটার ওপর পড়ার আগেই পিস্তলটা উঠিয়ে নিল। ওর বাঁ হাতের পিস্তলটাও গোল্ডীর হাতে দিল অলক। তারপর আরো কয়েকবার ধস্তাধ্বস্তির পর লুসির হাত দুটো মুচড়ে ওকে মেঝে থেকে ওঠাল। পেছন ঠেলতে ঠেলতে গোল্ডীর বেড-রুমের দিকে নিয়ে গেল ওকে। বেকায়দায় পড়ে লুসি তখন অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দিতে শুরু করেছে।

বেডরুম পর্যন্ত গিয়ে ওর হাত দুটো আরো ভালভাবে মুচড়ে ধরল অলক। গোল্ডীকে বেডরুমে ঢুকে বাথরুমের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে আসতে বলল। গোল্ডী ওর কথামত বেডরুম দিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

ও বারান্দা দিয়ে ফিরে আসতেই এক ধাক্কায় লুসিকে বেডরুমে ঢুকিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল অলক। লুসি তখন ভেতরে সমানে চিৎকার করে চলেছে—আমি তোকে দেখে নেব, শয়তানের বাচ্চা, তুই কি করে বাঁচিস্…।

বাঁ পাশের ঘরের দিকে অলক এবার ছুটে গেল। বন্ধ দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখল, এ ঘরে দীপককেও গোল্ডীর মত মুখে কাপড় গুঁজে বেঁধে রাখা হয়েছে। চটপট বাঁধনগুলো খুলতে লাগল অলক।

ছাড়া পেয়ে অলকের দিকে অবাক হয়ে তাকাল দীপক—আপনি?

—কোন কথা নয়, মিঃ সুরায়েকা। গোল্ডীর হাত থেকে দুটো পিস্তল উঠিয়ে একটা দীপকের হাতে দিতে দিতে বলল অলক, হারি আপ, ওরা

এসে পড়লে আরো মুশকিল হয়ে পড়বে।

—কিন্তু ওরা এসে পড়েছে, মিঃ মুখার্জী। এতক্ষণের বিহ্বল-বিমূঢ় গোল্ডীর মুখে কথা ফুটল।

পিস্তলটা শক্ত হাতে ধরে চমকে ওর দিকে তাকাল অলক—কোথায় ?

—বাথরুম থেকে বেরনোর সময় দেখলাম আমাদের বাংলোর পেছনের গর্তটায় তিনজন লাফ দিয়ে নামল। কিন্তু ওরা কারা, মিঃ মুখার্জি ?

গোল্ডীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বাইরের দরজার দিকে দ্রুত ছুটে গেল অলক।

তিনজন চাঁদমারীর দিক থেকে ছুটতে ছুটতে গোল্ডীর বাংলোর পেছনে খাদটায় এসে নামল। কুলদীপ, ভার্মা আর গুপ্তা।

বাংলোর দিকে তাকিয়ে কুলদীপ বলল—দাঁড়াও আর এগিও না। মেয়েটা, কে ছুটে গেল ভার্মা ?

—মনে হল গোল্ডী। উত্তেজিত স্বরে জবাব দিল ভার্মা।—বাথরুম থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে গেল বোধ হয়।

—তার মানে ওকে ছাড়িয়ে নিয়েছে অলক ? গুপ্তা আশঙ্কা-জড়িত স্বর নিয়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে।

—হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে। কুলদীপ গর্তের কানায় বুক ঠেকিয়ে একটু ওপরের দিকে উঁকি মারল।—এখানেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। পালানোর সময় আচমকা ধরতে হবে ওদের। কিন্তু গুপ্তা সাহেব, লুসির খবর কি। ওর হাতে আপনার পিস্তলটা ছিল না ?

তখনই ভার্মা কুলদীপের কাঁধে হাত রেখে গোল্ডীর বেডরুমের জানলার দিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।—লুসিকেও বন্দী করেছে অলক।

বিস্ফারিত চোখে কুলদীপ জানলাটার দিকে তাকাল। ভেতরে একটা মেয়ের ছায়া ছটফট করছে।

লুসির অবস্থা দেখে গুপ্তা এবার বলল—যতই পিস্তল থাক্, একটা মেয়ে কখনো অলকের মত ওস্তাদ ছেলেকে কাবু করতে পারে ? গুপ্তার স্বরে মনে হল ও যেন কিছুক্ষণ আগে অলকের হাতে হেনস্তা হবার একটা সান্ত্বনা

খুঁজে পেয়েছে।

—ঠিক আছে, দেখা যাক ও কত বড় ওস্তাদ। শেষ সময় ওর ঘনিয়ে এসেছে। কুলদীপ গর্জে উঠল।—ভার্মা, তুমি ডানদিকে একটু ঘেঁষে দাঁড়াও। সামনের রাস্তার দিকে খেয়াল রেখ। ওরা এদিক দিয়েই পালাবে।

তারপর ওরা কয়েক মিনিট নিঃশব্দ সরীসৃপের মত ঘাপটি মেরে বসে রইল সেখানে। কিন্তু লুসির লাফালাফি আর কতগুলো চিৎকার ছাড়া আর কোনকিছু ওদের নজরে পড়ল না।

কিছুক্ষণ পর গর্ত থেকে মাথা উঁচু করে ওদিকে তাকিয়ে কুলদীপ বলল, আমি একটু এগিয়ে দেখছি। ইশারা না করা অবধি তোমরা এখানেই থেক।

গর্ত থেকে উঠে হামাগুড়ি দিয়ে কাঁচা রাস্তাটা পেরিয়ে গেল কুলদীপ। বাংলোর ফেনসিং-এর কাছে গিয়ে ফাঁক দিয়ে কি যেন দেখল ভাল করে। তারপর আবার হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে এল ওদের কাছে।

—ভার্মা। ফিসফিসিয়ে বলল কুলদীপ। মনে হচ্ছে অলক বারান্দার কোণে ওৎ পেতে বসে আছে।

—তাই নাকি ?

—এদিকেই তাক্ করে আছে। উঠে এস। তোমাকে বাংলোর বাঁ দিক দিয়ে যেতে হবে। আমি এদিক দিয়েই যাচ্ছি। গুপ্তা সাহেব, আপনি এখানেই থাকুন।

গুপ্তা কোন জবাব দিল না।

ভার্মা গর্ত থেকে বেরিয়ে এল। দু'জনে পিস্তল হাতে বাংলোর দুদিকে নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিতে থাকল।

অন্ধকারে কুলদীপ বাংলোর ডান ধারে ফেনসিং-এর পাশে এসে থেমে গেল। সতর্ক হাতে মেহেদির ঝোপটা সরিয়ে দেখল, অলক একই ভাবে বারান্দার কোণে এদিকে মুখ করে বসে আছে। অবশ্য অন্ধকারে ছায়া ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে পিস্তল যে ওর হাতে আছে সেটা অবধারিত। তাই এর বেশী এক্ষুনি এগনো উচিত নয়। ভার্মা ওদিক থেকে এসে না পড়া অবধি মেহেদির ঝোপটার আড়ালেই ও ঘাপটি মেরে বসে রইল।

এদিকে ভার্মাও বাংলোর বাঁ-পাশের দেয়াল ঘেঁষে ফেনসিং অবধি

এসে পড়েছিল। এধারে অন্ধকার আরো বেশী। বারান্দার ওপাশটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। আস্তে আস্তে ও ফেনসিং ডিঙ্গিয়ে কমপাউণ্ডের ভেতর ঢুকল।

বাংলোটা থমথমে মনে হচ্ছে, যেন ভেতরে কেউ নেই। ফুলের কেয়ারি গুলো পেরিয়ে সতর্ক পায়ে ও বারান্দার প্রায় কাছাকাছি এসে উঁকি মারল। এবার দেখা গেল কে যেন বারান্দার ডান কোণে জবুথবু হয়ে বসে আছে। মুখটা ওর ওদিকেই। এক পা, দু পা, আরো সাবধান হয়ে এগিয়ে গেল ভার্মা। তারপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে লোকটা একেবারে বস্তার মত পড়ে গেল মাটিতে। ভার্মা চমকে হাত উঠিয়ে নিল। কুলদীপও ততক্ষণে ওদিক দিয়ে এসে পড়েছে। দুজনেই বারান্দায় লাইট জ্বালিয়ে দেখল যে ওটা মৃত চৌকিদারের লাশ, অলক নয়। লাশটা এমন ভাবে বারান্দার কোণে বসান ছিল যে দূর থেকে ওরা এতক্ষণ ওটাকে অলক ভেবে ভুল করেছে।

সন্ত্রস্ত হয়ে ওরা দু'জন দরজা দিয়ে ড্রয়িংরুমে ঢুকল। তারপর সবকটা ঘর পাগলের মত ছুটে দেখতে লাগল। কিন্তু অলক, গোল্ডী, দীপক কাউকেই পাওয়া গেল না। লুসি ছাড়া তখন বাংলোর মধ্যে কেউই নেই।

কিন্তু কি ভাবে গেল ওরা ? হতভম্ব কুলদীপ খোলা গেট দিয়ে দৌড়ে সামনের রাস্তায় এল। রাস্তার ওদিকে ঢালু জমিটার দিকে তাকাল ও। তিনজোড়া চোখকে ফাঁকি দিয়ে এই ঢালু জমিতে নেমেই কি ওরা নৈনীতাল হাইওয়ের দিকে পালিয়েছে ? অবশ্য সামনের গেটটা ওরা বাংলোর পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছিল না। ওদের মনে হয়েছিল এদিক দিয়ে বেরোলেও রাস্তা দিয়েই যাবে ওরা। নীচু জমিটার কথা ওদের একেবারেই খেয়াল ছিল না। তাছাড়া লাশটাও অনেকক্ষণ ধরে ধোকা দিয়েছে।

আর দাঁড়াল না দু'জন। চাঁদমারীর জঙ্গলের দিকে ওরা প্রাণপণ দৌড় লাগাল। পেছন পেছন গুপ্তাও।

কিন্তু ওদের বেহড়ের জঙ্গলের কাছাকাছি পৌঁছনোর আগেই জীপটা তীব্র-বেগে নৈনীতাল হাইওয়ের ওপর বেরিয়ে পড়েছিল। অলক ছিল

ষ্টিয়ারিংয়ে। পাশে শোভনা পেছনে দীপক। জঙ্গলের দিক থেকে গুলির শব্দ এল কয়েকটা। জীপের আওয়াজ পেয়ে দূর থেকেই ওরা গুলি ছুড়তে শুরু করেছে। কিন্তু জীপটা তখন গুলির নাগালের অনেক বাইরে।

অলক নিপুণ হাতে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে নৈনীতাল হাইওয়ের দিকে ওর গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

গাড়োয়ালী পাহাড়ের ঘাট শেষ হতে আর দেরী নেই। দুদিকে ঘন অন্ধকার নিয়ে জীপটা কাঠগুদামের দিকে ছুটে চলেছে। ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ শব্দ ছাড়া চারপাশটা থমথমে। রাস্তায় হেডলাইটের আলোটা পড়ে দ্রুত সামনের অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে।

অলক একমনে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। পাশে শোভনা গম্ভীর হয়ে বসে কিছু ভাবছে বোধহয়।

দীপক স্থুরায়েকা নৈনীতালে নেমে গেছে। জীপের ভেতর ওদের শেষ কথাটি সেখানেই হয়েছিল। তারপর থেকে দু'জন চুপচাপ।

নৈনীতাল পর্যন্ত আসতে আসতে অলক ওদের সব ঘটনা বলে ছিল। কলকাতায় গোল্ডীর সঙ্গে মিথ্যে পরিচয়ের আলাপ থেকে নিয়ে রানীক্ষেত টেলিফোনসএ ওর সেক্রেটারী সেজে ফোন করা অব্দি—কোন কিছুই ও গোপন রাখেনি।

দীপক যখন সেখানে নেমে যায় অলক সবশেষে বলেছিল, মিঃ স্থুরায়েকা, সবই শুনলেন। আমি যে আপনারই বিরুদ্ধে একটা জঘন্য অপরাধ করতে এসেছিলাম তাও বলেছি। এবার আপনি কি করবেন তা সম্পূর্ণ আপনার ওপর নির্ভর করছে। ক্ষমা চাইবার মুখ আমার নেই। আচ্ছা, গুডবাই।

অন্যমনস্ক দীপক বিষণ্ণ মাথা নেড়েছিল। দু-হাত দিয়ে অলকের ডান হাত ধরে গাঢ় একটা করমর্দন করে নেমে গিয়েছিল।

তারপর সেই যে জীপ চলল, শোভনা একটা কথাও বলেনি, অলকও না। অন্ধকারে টানা দু-ঘণ্টা ওরা একভাবে সামনের সীটে বসেছিল—শুধু অলকের হাতে ষ্টিয়ারিং।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কাঠগুদাম রেলষ্টেশনের বাতিগুলো দেখা গেল। শেষ রাতে বেরেলী প্যাসেঞ্জার ছাড়বে ওখান থেকে। ওটা ধরতে হবে বলেই অলক গাড়ির গতি আরো তীব্র করল।

ষ্টেশনের ধার ঘেঁষে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল অলক। শোভনাকে ইশারায় নামতে বলে ও টিকিট কাউন্টারের দিকে ছুটল। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে ষ্টেশনে।

টিকিট কেটে অলক জানল ট্রেন ছাড়তে আর মাত্র দু-তিন মিনিট বাকী।

শোভনাকে নিয়ে অলক দ্রুত পায়ে প্ল্যাটফরমের ভেতর ঢুকল। ফাষ্ট ক্লাশ কামরার কাছে গিয়ে টিকিট-টা ও শোভনার হাতে দিল।

একটা টিকিট দেখে শোভনা চমকে উঠে অলকের দিকে তাকাল, —আমি কি একাই ফিরছি?

মাথা নেড়ে সায় দিল অলক। শোভনা কিছু না বলে ওর চোখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ওর চোখের পাতা থির-থির করে কেঁপে উঠল। তারপর ও হঠাৎ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল অলকের বুকের ওপর। ঠোঁট কাঁপিয়ে বলল—না, না, এরকম কথা ছিল না অলক! তুমি বলেছিলে কলকাতা ফেরা অব্দি আমার কাছাকাছি থাকবে সবসময়। এখন তুমি কিছুতেই ছেড়ে যেতে পারো না। না, কোনমতেই না।

শোভনার আকস্মিক সমর্পণ অলককে বিবশ করে দিল।

আস্তে আস্তে ওর ডান হাতটা নিজের বুকের ওপর ওঠাল অলক। শোভনার সামনের লালচে কালো চুলের গোছ সরিয়ে ওর কপালটা বের করল। তারপর ওর সারা গাল জুড়ে গাঢ় স্পর্শ বুলিয়ে চিবুক ধরে বলল—না শোভনা, তা হয় না। আমি আর ফিরতে পারি না। তোমাকে তো বলেছি, ডিকি কি সাংঘাতিক লোক।

ডিকির নাম শুনেই শিউরে উঠল শোভনা। ওর কাহিনী নৈনীতাল অবধি ও অলকের মুখে শুনে এসেছে। অলকের শেষ কথাটার তাৎপর্য ও বুঝতে পারল।

না, না, অলকের কোন ক্ষতি ও চায় না। জোর করেই নিজেকে সংযত করল শোভনা। কিছুক্ষণ অলকের বুকে মাথাটাকে নিবিড় ভাবে রেখে

তারপর একটা গাঢ় চাপ দিয়ে উঠিয়ে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে গার্ডের সবুজ আলো জ্বলল। ইঞ্জিনও হুইসিল দিল।

আড়ষ্ট পায়ে শোভনা এগিয়ে গেল ওর কামরার দিকে। দরজায় উঠে অলকের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। ওর চোখ তখন চিকচিক করছে। সেই চোখ, যে চোখে গত রাতে অলক নিরুদ্দেশ হতে চেয়েছিল।

আজ ভোরের আলোয় আবার সেই চোখ দেখল অলক। সে মুহূর্তে ওর মনে পড়ল, শোভনার সেই প্রশ্নটা, 'তাহলে কি এর সাথেই সব শেষ ?'

অলকের সামনে আবার সারা পৃথিবীটা দুলে উঠল। কি যেন হারানোর অজানা ব্যাথায় ভেতর থেকে কেঁপে উঠল ও। শোভনার টলটল চোখের দিকে তাকিয়ে একবার ও থমকে দাঁড়াল। তারপরেই ছুটে গেল।

কিন্তু বেরেলী প্যাসেঞ্জার ততক্ষণে তীব্র একটা হুইসিল দিয়ে স্টেশন ছেড়ে দিয়েছে। অলক ঘুরে দাঁড়াল। সেই দুটো টলটলে চোখের দিকে আর সে তাকাতে পারল না।